বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

ঝিন্দের বন্দী	৩৲
গৌড়মল্লার	৪৲
ছায়াপথিক	৩৲
কালের মন্দিরা	৩॥০
কালকূট	২॥০
কাঁচামিঠে	২॥০
বিষকন্যা	২॥০
শাদাপৃথিবী	৩৲
পঞ্চভূত	২॥০
দুর্গরহস্য	৩॥০
ব্যোমকেশের গল্প	২॥০
ব্যোমকেশের কাহিনী	২॥০
ব্যোমকেশের ডায়েরী	২॥০
কানামাছি	২॥০
যুগে যুগে	২॥০
পথ বেঁধে দিল	২॥০
বন্ধু	১৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

ফেড্ ইন।

সকালবেলার কলিকাতা। বেলা আন্দাজ ন'টা। চায়ের দোকানের ভিড় কমিয়া গিয়াছে; মনিহারীর দোকানপাট খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেস্-হোষ্টেলের ঠাকুর-চাকর ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাজার করিয়া ফিরিতেছে। শ্রাবণ মাস; কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আবার রোদ উঠিয়াছে। ভিজা ফুটপাথ পথচারীর পায়ে পায়ে শুকাইয়া উঠিতেছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের মত বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একটি দোকান। বাড়ীটি দ্বিতল, দুইতলার মাঝখানে কার্নিসের উপর তিন ফুট উঁচু সোনালী অক্ষরে লেখা আছে—মনোহর ভাণ্ডার। উপরে সারি সারি জানালা; নীচে দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা। সদর দরজাটি খুব চওড়া; ঘষা কাঁচের কবাট, দরজা হইতে দুই ধাপ নামিয়া ফুটপাথ।

ঠিক দরজার সামনে ফুটপাথের উপর একটি ক্ষুদ্র গর্ত আছে। এই গর্তটিকে গাবু করিয়া নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি ছেলে মারবেল খেলিতেছে। তাহাদের সকলেরই বয়স পনেরো বছরের নীচে; গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়, কেউ বা স্রেফ একটি হাফ-প্যান্ট পরিয়া আছে। কাহারও মুখে হাসি নাই; সকলে গভীরভাবে খেলায় মগ্ন।

যে ছেলেটি এই দলের সর্দ্দার তাহার নাম কার্তিক। কালো শীর্ণ ছেলেটি, দেখিলে মনে হয় দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; কিন্তু মুখেচোখে চোখা বুদ্ধি জ্বলজ্বল করিতেছে। সে গভীর মনঃসংযোগে মারবেল খেলিতেছে, দলের ছেলেদের প্রয়োজন মত শাসন করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া চাপা আওয়াজ বাহির হইতেছে—চিকা চিকা বুম্! কবে কোন্ গ্রামোফনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বিলাতী রের্কড শুনিয়াছিল, সেই গানের একটি পদ তাহার মস্তিষ্কে ছাপ মারিয়া দিয়াছে—চিকা চিকা বুম্!

ইতিমধ্যে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে; কাউণ্টারে যে সব কর্ম্মচারী কাজ করে তাহারা একে একে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। একজন উর্দিপরা চাকর, কাঁধে ঝাড়ন ও হাতে পিজবোর্ডের কয়েকটি ফলক লইয়া বাহির হইয়া আসিল; অত্যন্ত অবহেলাভরে দরজার কাঁচের উপর ঝাড়ন চালাইয়া ফলকগুলি টাঙাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইল। ফলকগুলির কোনটিতে লেখা আছে—'বিলাতী প্রসাধন দ্রব্য', কোনটিতে—'ফাউণ্টেন পেনের কালি অমাবস্যা' কোনটিতে—'বিলাতী কাচের বাসন' ইত্যাদি।

কার্তিকের দল খেলিয়া চলিয়াছে; পথিকদের যাতায়াতের ভিতর দিয়া তাহাদের পাথরের গুলী ছুটিতেছে; গুলী খেলার বিচিত্র পরিভাষা মাঝে মাঝে তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে—'গাবু!' 'পিল!' 'নটু কিচ্ছু!' কার্তিকের গলায় অন্তর্গূঢ় আওয়াজ হইতেছে—চিকা চিকা বুম!!

মনোহর ভাণ্ডারের ম্যানেজার নীলাম্বর বাবু বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে একটি পিজ্ বোর্ডের ফলক। নীলাম্বরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ঘিয়ে ভাজা চেহারা—অত্যন্ত খাঁটি

লোক। তাঁহার একটি স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে, থাকিয়া থাকিয়া বাম চক্ষুটি নাচিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া যায়, মনে হয় তিনি চোখ টিপিতেছেন।

ফলকটি তিনি দরজার গায়ে টাঙাইয়া দিলেন। দেখা গেল তাহাতে লেখা আছে—

নূতন কর্ম্মচারী চাই।

ভিতরে অনুসন্ধান করহ।

ফলক ঝুলাইয়া দিয়া নীলাম্বর ক্রীড়ারত বালকদের দিকে ফিরিলেন, ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন—

নীলাম্বর: আরে গেল যা! ঠিক দরজার সামনে তোদের খেলবার যায়গা! বেরো বেরো, দুনিয়ার জঞ্জাল সব। ধাপার গাড়ী তোদের এখনও নিয়ে যায়নি কেন—অ্যাঁ! (নীলাম্বর চক্ষু স্পন্দিত করিলেন) বেরো দূর হ' ছোট লোকের ছোঁড়া সব—

কার্তিক ও তাহার দল নিজ নিজ গুলী হাতে লইয়া এমন সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে নীলাম্বর যদি কেবলমাত্র বাক্যবল প্রয়োগে সন্তুষ্ট না হইয়া বাহুবল প্রয়োগে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহা না করা পর্য্যন্ত এমন সুন্দর গাবু ছাড়িয়া তাহারা কিছুতেই অন্যত্র যাইবে না। যা হোক, নীলাম্বর আর অধিক হাঙ্গামা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা তখন কার্তিকের পানে তাকাইল। উত্তরে কার্তিক দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

আবার খেলা আরম্ভ হইল।

ক্যামেরা তখন দরজা দিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল।

ডিজলভ

দোকান ঘরটি খুব বড়, এমপোরীয়ম জাতীয় বিলাতী দোকানের মত সাজানো। তিনটি দেয়াল ঘিরিয়া কাঠের কাউণ্টার চলিয়া গিয়াছে, পিছনে প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু আলমারী—পণ্যদ্রব্যে ঠাসা। ঘরের মাঝখানেও ইতস্তত কাঁচের শো-কেসে শৌখীন পণ্যদ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। সদর দরজার বাম পাশে স্বত্বাধিকারীর অফিস ঘর; ডান পাশ দিয়া প্রশস্ত সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির রেলিংয়ের নিম্নতম স্তম্ভে ইংরেজীতে লেখা—Proprietor, স্তম্ভের নীচে মেঝের উপর কয়েকটি চায়ের প্যাকেট উপরাউপরি সাজানো, তাহার উপর দিয়া কেবল ঐ Proprietor কথাটি জাগিয়া আছে।

দোকানে এখনও খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করে নাই; কাউণ্টারের পিছনে গুটিচারেক কর্ম্মচারী একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে গুজগুজ্ করিতেছে।

প্রথম কর্ম্মচারী : আর কি, এবার পাততাড়ি গুটোও। আমাদের অন্ন উঠল।

দ্বিতীয় কর্ম্মচারী : কী—নতুন কিছু হয়েছে নাকি ?

প্রথম কর্মচারী : দেখোনি ? বাইরে ইস্তাহার টাঙানো হয়েছে—নতুন কর্ম্মচারী চাই। বুড়ো কর্ত্তার আমলের সাবেক যারা ছিল তারা তো সব বিদেয় হয়েছে, এবার আমাদের পালা—

তৃতীয় কর্ম্মচারী : নতুন মালিক, চাকরও রোজ নতুন চাই! তা আমার তো মোটে এক মাসের চাকরি। যায় যাবে।

এই সময় সদর দরজা দিয়া একটি বৃদ্ধ খরিদ্দার প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের বেশভূষা একটু অদ্ভুত—গায়ে একটি প্রাচীন ওয়াটার প্রুফ, মাথায় মঙ্কিক্যাপ, চোখের কালো চশমা মুখের ঊর্দ্ধভাগ প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মচারীরা তাহাকে লক্ষ্য করিল,

কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া চলিল। একজন বয়স্থ কর্ম্মচারী মাথা নাড়িয়া বলিল—

চতুর্থ কর্ম্মচারী : বিল্বিপত্তর দেখছি আমাকেই গোঁকাবে। আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো, তিন মাস চাকরী করছি।

দ্বিতীয় কর্ম্মচারী : কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম!

প্রথম কর্ম্মচারী : কর্ত্তা না হাতী—ও গোবর গণেশের মাথায় কি কিছু আছে। আসলে ঐ মিটমিটে শয়তান, ঐ ভিজে বেরালটি, যিনি কথায় কথায় চোখ মারেন (চোখ টিপিয়া দেখাইল) সব তাঁরই প্যাঁচ। এই বলে দিলুম দেখো তোমরা, ম্যানেজার হয়ে ঢুকেছে—ফাল হয়ে বেরুবে।

সকলেই গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িল।

চতুর্থ কর্ম্মচারী : আশ্চর্য্য নয়। এই যে ঘন ঘন লোক বদল করছে এর মধ্যে কোনও মাচ্‌কোফের আছে। পুরোনো লোক থাকলেই তো জানতে পারবে, কোথায় কি কারচুপি হচ্ছে ধরা পড়ে যাবে—তাই কাউকে আর পুরোনো হ'তে দিচ্ছে না।

এই সময় কাউণ্টারের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। কিছু দূরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ খরিদ্দারটি অধীরভাবে কাউণ্টারের উত্তর একটি পয়সা দিয়া টোকা দিতেছেন।

প্রথম কর্ম্মচারী মুখ ব্যাজার করিয়া তাঁহার দিকে গেল; বৃদ্ধ পয়সাটি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধ : এক পয়সার নস্যি।

ক্যারমের ঘুঁটির মত আঙ্গুল দিয়া পয়সাটি বৃদ্ধের দিকে ফিরাইয়া দিয়া কর্ম্মচারী তাচ্ছিল্যভরে মুখ বিকৃত করিল।

প্রথম কর্ম্মচারী : এক পয়সার জিনিস এখানে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধের মাথায় বোধ করি ছিট আছে; তিনি চশমা কপালে তুলিয়া ক্ষণেক কর্ম্মচারীর পানে কট্‌ মট্‌ করিয়া তাকাইলেন, তারপর আবার চশমা যথাস্থানে নামাইলেন।

বৃদ্ধ: কী! পাওয়া যায় না। আমি চল্লিশ বছর ধ'রে এই মনোহর ভাণ্ডার থেকে নস্যি নিচ্ছি আর বললে কি না পাওয়া যায় না?

বিরক্তি দমন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে কর্ম্মচারী বলিল—

প্রথম কর্ম্মচারী: আরে মশায়, সেদিন আর নেই। আগে শুনেছি বুড়ো মালিকের আমলে এক পয়সার নস্যি, দু'পয়সার পেন্‌সিল্‌, তিন পয়সার জুতোর ফিতে পাওয়া যেত; এখন নতুন কর্ত্তার আমলে সে সব বদলে গেছে। দু'চার পয়সা দামের মাল দোকানে আর রাখা হয় না।

বৃদ্ধ আবার চশমা তুলিয়া কর্ম্মচারীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া ক্রুদ্ধভঙ্গীতে পয়সা তুলিয়া লইলেন।

কাট্‌

মনোহর ভাণ্ডারের বাহিরে রাস্তার অপর পারে একটি লাল রঙের ফায়ার-অ্যালার্ম স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া একটি যুবক একদৃষ্টে মনোহর ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার পিছনে এক সারি ছোট ছোট দোকান ঘর বন্ধ রহিয়াছে; তাহাদের মাথার উপর লম্বা বোর্ড টাঙানো—'দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে'।

যুবকের নাম বিজয়। সুদর্শন চেহারা কিন্তু বেশ বাস অত্যন্ত মামুলি, এমন কি দারিদ্র্যের পরিচায়ক বলিলেও চলে। সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কার্তিকের দল তখনও অনন্ত মনে মার্বেল খেলিয়া চলিয়াছে।

কর্ম্মখালির ফলকটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া বিজয় সচকিতভাবে

চারিদিকে তাকাইল, তারপর চট করিয়া ফলকটি উল্টাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দেখা গেল, ফলকের উল্টা পিঠে লেখা আছে—

বাদসাহী সাবু

স্বয়ং বাদশা আলমগীর ব্যবহার করিতেন।

বিজয় যে সময় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ খরিদ্দারটী সবেগে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন ; দু'জনের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। বিজয় মাপ চাহিল, কিন্তু বৃদ্ধ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া বিজয় দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড ঘর ; দূরে খরিদ্দার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন কর্ম্মচারীরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করিতেছে। কাহার কাছে অনুসন্ধান করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া বিজয় চারিদিকে তাকাইল। সিঁড়ির স্তম্ভে Proprietor কথাটী তাহার চোখে পড়িল।

বিজয় একটু দ্বিধা করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল একেবারে মালিকের সঙ্গে দেখা করাই ভাল। কয়েক ধাপ উঠিবার পর সে দেখিল, সিঁড়ি দিয়া একটী তরুণী নামিয়া আসিতেছেন। তরুণীটি দেখিতে সুন্দরী ; হাতে দু'খানি বই ; পরিধানের কাপড় চোপড় দেখিতে সাদাসিধা হইলেও মূল্যবান্। তরুণী বিজয়কে সোপান আরোহন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

বিজয় ভাল ছেলে, সে তরুণীকে এক নজর দেখিয়া লইয়া সম্ভ্রমের সহিত পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তরুণী কিন্তু বড় বড় চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিতেই লাগিলেন ; বিজয় যখন তাহাকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল তখনও তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় সিঁড়ির মোড় ঘুরিয়া দু'ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় তরুণীর কণ্ঠস্বর আসিল—

তরুণী : শুনুন—

বিজয় থামিয়া নীচের দিকে তাকাইল। তরুণীর দৃষ্টি যে অস্বস্তিকরভাবে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাহা সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—

বিজয় : আমাকে বলছেন ?

তরুণী : হ্যাঁ। আপনি কোথায় চলেছেন ?

বিজয় : (বিরসকণ্ঠে) দেখতেই পাচ্ছেন ওপরে যাচ্ছি।

তরুণীর দৃষ্টি খর হইয়া উঠিল।

তরুণী : তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওপরে আপনার কি দরকার ?

বিজয়ের একটু রাগ হইল ; সে ভাবিল তরুণীটি দোকানেব একজন বড়-মানুষ ক্রেতা, তাহার দীনবেশ দেখিয়া অনধিকার স্পর্ধা· প্রকাশ করিতেছে। তাহার কণ্ঠস্বর তিক্ত হইয়া উঠিল।

বিজয় : দরকার কিছু আছে বৈকি। কিন্তু সে খবরে আপনার কি দরকার জানতে পারি কি ?

তরুণী : আমার দরকার এই যে ওপর তলায় আমি থাকি।

বিজয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, তারপর কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়া তরুণীর কাছে দাঁড়াইল।

বিজয় : মাপ করবেন, আমার ধারণা ছিল দোকানের মালিক ওপরে থাকেন।

তরুণী : আমি দোকানের মালিকের মেয়ে।

বিজয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল ; দোকানের মালিকের যে কন্যা থাকিতে পারে ইহা তাহার কল্পনায় আসে নাই। কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। বিজয় বুদ্ধিমান ছেলে, সে বুঝিল কথাটা

মিথ্যা না হইতে পারে। সে কখনও দেখে নাই বলিয়া দোকানদারের মেয়ে থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। তরুণী ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছেন—

তরুণী : আমার বাবা রায় বাহাদুর ধনেশ রায় এই দোকানের মালিক। ওপর তলাটা দোকান কিম্বা অফিস নয়, ওখানে আমরা থাকি—Private—

বিজয় : (কুণ্ঠিত কণ্ঠে) কিন্তু সিঁড়ির থামে লেখা রয়েছে—

তরুণী : কি লেখা রয়েছে চলুন তো দেখি।

দু'জনে পাশাপাশি নামিয়া আসিল; বিজয় ঈষৎ বিজয় গর্ব্বের সহিত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া Proprietor লেখা দেখাইল।

বিজয় : এই দেখুন।

তরুণী একটু হাসিয়া অধর কুঞ্চিত করিলেন, তারপর উপরের চায়ের প্যাকেটটি তুলিয়া লইলেন; তখন দেখা গেল, Proprietor এর নীচে লেখা আছে Private. বিজয় কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া তরুণীর দিকে ফিরিল, সবিনয়ে হাত যোড় করিয়া বলিল—

বিজয় : আমারই ভুল—চায়ের প্যাকেট তুলে অনুসন্ধান করার-কথা আমার মনে হয়নি। ক্ষমা করবেন।

চায়ের প্যাকেটটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তরুণী হাসিলেন। এই দীনবেশী যুবকটী যে সহজে পরাভব স্বীকার করিবার লোক নয় তাহা তিনি বুঝিলেন, সহজ শিষ্টতার কণ্ঠে বলিলেন—

তরুণী : আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিজয় : (শুষ্কস্বরে) ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—আজ বোধ হয় আমার যাত্রাটা বড় খারাপ হয়েছিল। দোকানে ঢুকতে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, তারপর আপনার সঙ্গে এই ঠোকাঠুকি!—কাজ নেই ফিরেই যাই।

তরুণী : না না, দেখা না ক'রে ফিরে যাবেন কেন ? যদি কোনও জরুরী দরকার থাকে—

বিজয় : আমার পক্ষে জরুরী দরকারই বটে। আপনার বাবা নতুন কর্ম্মচারী চান—তাই—

কথাটা বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া দিল। তরুণী হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন ; বিজয়কে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চাকরী-ভিক্ষার্থী বলিয়া মনে হয় না, স্বাধীনচেতা শিক্ষিত লোক বলিয়া মনে হয়। তরুণী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—

তরুণী : তা যান না—ঐ যে বাবার অফিস—

তিনি অফিস ঘরের দ্বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন। বিজয় একটু ইতস্তত করিল।

বিজয় : আপনি বলছেন যখন দেখা করেই যাই। মরার বাড়া তো গাল নেই।—ধন্যবাদ।

তরুণীকে নমস্কার করিয়া বিজয় অফিস ঘরের দিকে চলিল। তরুণী কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কাট।

সদর দরজার সম্মুখে ইতিমধ্যে একটি দামী বড় মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্ত্তিকের দল ফুটপাথে পূর্ব্ববৎ খেলিয়া চলিয়াছে।

তরুণী আবির্ভূতা হইতেই মোটরের চালক ঝুঁকিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ি শূন্যই ছিল, তরুণী প্রবেশ করিয়া বসিলেন। চালক গাড়ীতে স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তরুণী বলিয়া উঠিলেন—

তরুণী : ইয়ে—মহেশ, একটু অপেক্ষা কর, এখনও কলেজের দেরী আছে—

মহেশ : আজ্ঞে।

মহেশ ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। তরুণী তখন একখানি বই খুলিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষুদুটি বই ছাড়িয়া দোকানের দরজার দিকে ফিরিতে লাগিল। সদ্য দেখা যুবকটির ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভাগ্যে চাকরী জুটিল কিনা তাহা না দেখিয়া তিনি কলেজে যাইতে পারিতেছেন না।

কাট্।

ওদিকে বিজয় অফিস ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই এক তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি দেখা দিল; বিজয়ের বেশভূষা দেখিয়া, শিষ্টতার কোনও চেষ্টা না করিয়া বলিল—

চাপরাশি : ক্যা মাংতা ?

বিজয় : মালিকসে মুলাকাৎ মাংতা।

চাপরাশি : ক্যা কাম ?

বিজয় : নোকরি।

চাপরাশির চোখের অবজ্ঞা আরও বাড়িয়া গেল।

চাপরাশি : ঠাহরো—রায় বাহাদুরকো এত্তালা দেনা হোগা।—বৈঠো বিরিঞ্চ্ পর।

চাপরাশি মালিকের সম্মুখে আবির্ভূত হইবার পূর্বে দেয়াল সংলগ্ন একটা আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পাগড়িটা ঠিক করিয়া লইতে লাগিল। বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল। চাপরাশির কথা তাহার অঙ্গে সুধাবৃষ্টি করে নাই; কিন্তু সে প্রার্থী—করিবার কিছু নাই।

কাট্।

অফিস ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বিপুলকায় রায় বাহাদুর ধনেশ রায় বসিয়া আছেন। আহ্লাদী পুতুলকে পাম্প্ করিয়া বড়

করিলে যেরূপ দেখিতে হয় তাঁহার চেহারাটি সেইরূপ। সর্বাঙ্গে থাকে থাকে চর্বির থর নামিয়াছে; মুখে বুদ্ধির চিহ্ন যদি বা কখনও ছিল এখন তাহা চর্বির অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়াছে। রায় বাহাদুর ধনেশ বসিয়া বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত একটি আপেল ভক্ষণ করিতেছেন। ডাক্তার তাঁহাকে দিনে তিনটি করিয়া আপেল ভক্ষণ করিবার বিধান দিয়াছে, তিনি ডাক্তারের আদেশ চতুর্গুণ পালন করিয়া চলেন—এক ডজন আপেল খান। টেবিলের ওপর থরে থরে আপেল সাজানো রহিয়াছে।

অফিস ঘরটি মাঝারি আয়তনের; খুব ফিট্‌ফাট্‌ সাজানো। টেলিফোন আছে। রাস্তার দিকে একটা বড় জানালা; সেই জানালার গরাদ ধরিয়া নীলাম্বর বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। রাস্তার অপর পারে যে দোকানঘরগুলা ভাড়া দেওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেগুলো এই জানালা দিয়া স্পষ্ট-দেখা যায়।

ধনেশ আপেলের জাবর কাটিতে কাটিতে তৃপ্তি-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন—

ধনেশ: চার মাসে মনোহর ভাণ্ডারের চেহারা বদলে' দেওয়া গেছে, কি বল নীলাম্বর—অ্যাঁ?

নীলাম্বর ধনেশের দিকে ফিরিয়া একটি তৈলাক্ত হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন।

নীলাম্বর: সে কথা আর বলতে। তুমি যা করেছ তাকে তো ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন বলা চলে—নল্‌চে খোল সব বদলে দিয়েছ।

নীলাম্বরের দুষ্ট চক্ষুটি স্পন্দিত হইয়া উঠিল; ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক স্নায়বিক ক্রিয়াও হইতে পারে, আবার অর্থপূর্ণও হইতে পারে। ধনেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না, গদগদ মুখে হাসিলেন।

ধনেশ: বাবা যদি এখন এসে দেখেন, দোকান চিনতে পারবেন

না।—কিন্তু একথাও বলতে হবে, তুমি সাহায্য না করলে আমি একলা কিছুই করতে পারতুম না।

নীলাম্বর: আরে না না, আমি আর কী করেছি—কাঠবেড়ালীর সাগর বন্ধন। তবে যেটুকু করেছি প্রাণের টানে করেছি। ইস্কুলের বন্ধু আমি তোমার, আমি যদি না করি কে করবে বল? বরং তুমি যে ভালবেসে আমাকে ম্যানেজার করেছ এইটেই তোমার মহত্ব।

পরস্পরের পিঠ চুল্‌কানি হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলিত; কিন্তু এই সময় দ্বারে টোকা পড়িল এবং চাপরাশি সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিল।

চাপরাশি: হুজুর, এক আদমি নৌকরিকে লিয়ে মুলাকাৎ মাংতা হ্যায়।

ধনেশ: ও—আসতে সুরু করেছে! আচ্ছা—তাহলে নীলাম্বর—?

ধনেশ সপ্রশ্নভাবে নীলাম্বরের পানে চাহিলেন। সকল কার্যের আরম্ভে তিনি এইভাবে নীলাম্বরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; নীলাম্বর এমন মোলায়েমভাবে তাঁহার পথনির্দেশ করিয়া দেন যে, ধনেশ ভাবেন, তিনি নিজেই পথ চিনিয়া লইয়াছেন।

নীলাম্বর: হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, তাড়াতাড়ি কিসের? (চাপরাশিকে) এই, তুম্ আদমিকে বসতে বল। সাহেব যখন ঘন্টি বাজাবে তখন পাঠিয়ে দিও।

চাপরাশি: হুজুর।

চাপরাশি বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর যে ধনেশের ইচ্ছাটাই প্রকাশ করিয়াছেন এমনিভাবেই বলিলেন—

নীলাম্বর: সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি তুমি কি চাও। ঠিকই তো! চাকরির উমেদারী করতে এসেছে খানিক বসুক, মাটি ভাপাক। নৈলে চট্ করে ডাকলে ভাববে, আমাদেরই বুঝি গরজ—

ধনেশ বুঝিতে পারিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে একটি বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন, তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ধনেশ: হুম—

নীলাম্বর: যাই বল ধনেশ, পাকা ব্যবসাদার বটে তুমি! কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় এইটেই তো ব্যবসার গোড়ার কথা। আমি বলতে পারি কলকাতা সহরে যত ব্যবসাদার আছে সব্বায়ের তুমি কান কেটে নিতে পার।

ধনেশ আর আত্মশ্লাঘা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

ধনেশ: সে কি আমি জানি না! কিন্তু বাবার ধারণা আমি ব্যবসার কিছুই বুঝি না। গবর্মেণ্টকে চাঁদা দিয়ে রায় বাহাদুর হলুম, আর আমি ব্যবসা বুঝিনা—বল তো নীলাম্বর!

নীলাম্বর: তোমার বাবা সেকেলে মানুষ, আধুনিক ব্যবসার ধরণ-ধারণ তো কিছু বোঝেন না। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত দোকানের ভার তোমাকে দিয়ে যে কাশীবাসী হয়েছেন, শেষ বয়সে এই একটি মাত্র বুদ্ধির কাজ করেছেন।

ধনেশ: আমিও দেখিয়ে দেব এবার Modern Styleয়ে ব্যবসা কি করে চালাতে হয়।

বলিয়া ধনেশ টেবিলের উপর একটী কিল মারিলেন। দৈবক্রমে টেপা-ঘণ্টিটা ঐখানেই ছিল, আচমকা কিল খাইয়া বাজিয়া উঠিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘরে প্রবেশ করিল। ধনেশের কাছে কার্যকারণ সম্বন্ধটা ধরা পড়ে নাই, তিনি চমকিয়া উঠিলেন—

ধনেশ: অ্যাঁ, একি! কে তুমি? বলা নেই কওয়া নেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে!—নীলাম্বর!

নীলাম্বর ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিম্নস্বরে কহিলেন—

নীলাম্বর: ঘণ্টি শুনে এসেছে। যাক্—কী চাও তুমি?

বিজয়ের মাথার ভিতরটা গরম হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। প্রথমে দারোয়ানের অবহেলা, তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, শেষে এই অশিষ্ট সম্ভাষণ তাহার স্বাভাবিক নম্র প্রকৃতিকে রূঢ় করিয়া তুলিল। সে একবার ধনেশের দিকে একবার নীলাম্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—'

বিজয়: আপনাদের মধ্যে মালিক কোনটি? তাঁকেই জবাব দেব।

ধনেশ এই উক্তি ঘোর অপমানকর বলিয়া মনে করিলেন; এ কেমন ছোকরা, তাঁহাকে দেখিয়াও মালিক বলিয়া চিনিতে পারে না? তিনি উগ্র একটা কিছু বলিবার ভূমিকা স্বরূপ টেবিলের উপর একটা চাপড় মারিলেন, কিন্তু তিনি বাক্য নিঃসরণ করিবার পূর্ব্বেই নীলাম্বর তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—

নীলাম্বর: ইনি মালিক—রায়বাহাদুর ধনেশ রায়। কী দরকার তোমার চট্‌পট ব'লে বিদেয় হও, নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের।

বিজয়: আমারও নেই। কাজ করে যারা খেতে চায় তাদের সময় আপনাদের চেয়েও কম।—(ধনেশকে) আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কর্ম্মচারী চাই, তাই এসেছি। ভিক্ষার্থী মনে করবেন না, কারণ আপনি যেমন আমায় পয়সা দেবেন আমিও তেমনি আমার পরিশ্রম আপনাকে দেব।

ধনেশ থ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কারণ এ ধরণের কথাবার্ত্তায় তিনি অভ্যস্ত নন।

নীলাম্বরের বক্র চক্ষু বিদ্রূপে নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বর: খুব যে কমরেডি বুলি ঝাড়ছ ছোকরা। শূন্য কলসিই বেশী ঢন্ ঢন্ করে। চাকরি করবার যোগ্যতা কিছু আছে? কি qualification তোমার?

বিজয়: বি এ পাশ করেছি।

নীলাম্বর নাকি স্থরে হাসিয়া উঠিলেন।

নীলাম্বর: বি এ পাশ? তবে তো তুমি অপদার্থ।

ধনেশ এতক্ষণে বলিবার মত একটা বিষয় পাইলেন।

ধনেশ: Worthless, Worthless তোমার মত লোক আমি চাই না। কলেজে যারা ঢুকেছে, তারা তো—অ্যাঁ নীলাম্বর?

নীলাম্বর: ষাঁড়ের গোবর। তুমি যেতে পার।

বিজয়ের মুখে একটা খরশান হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয়: বুঝতে পারছি আপনারা কেউই কলেজের চৌকাট পার হন নি; সেটা তেমন দুঃখের বিষয় নয়, কারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের সমান হয় না। কিন্তু আপনারা ভদ্রতা-শিক্ষার স্কুলেও ঢোকেন নি এইটেই লজ্জার কথা।—নমস্কার!

বিজয় বাহির হইয়া গেল। ধনেশ ও নীলাম্বর হতবাক হইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিলেন!

কাট্।

দোকানের সদরে মোটর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তরুণী মাঝে মাঝে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দ্বারের পানে তাকাইতেছেন। ফুটপাথে ছেলেরা খেলিয়া চলিয়াছে। মহেশ ড্রাইভার গাড়ির পিছন দিকে দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে একটা বিড়ি টানিয়া লইতেছে।

বিজয় বাহির হইয়া আসিল; মুখে চোখে অবরুদ্ধ ক্রোধের উষ্মা। মনের এরূপ অবস্থা বিপজ্জনক, কারণ এ সময় বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না। বিজয় ফুটপাথে নামিয়াই কার্ত্তিকের গুলীর উপর পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ! পা পিছলাইয়া বিজয় সশব্দে ফুটপাথে আছাড় খাইল।

মোটরের ভিতর হইতে একটী তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য সহসা উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিল। ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিয়া নিজ নিজ মার্বেল কুড়াইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিজয় বেদনা-বিকৃত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, অর্দ্ধেক উঠিয়া পায়ের গোছ ধরিয়া বসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক পলায়ন করে নাই; সে বিজয়কে উৎসাহ দিয়া বলিল—

কার্তিক: উঠে পড়ুন স্যার—কিছু লাগেনি—

মোটরে বসিয়া তরুণী প্রথমটা হাসিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের ব্যথা বিদ্ধ মুখ দেখিয়া তাঁহার হাসি থামিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন।

ওদিকে কার্তিক দু'হাতে বিজয়ের বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে।

কার্তিক: উঠুন স্যার—এঁইয়ো! চিকা চিকা বুম!

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধে ভর দিল, হাসিবার ক্লিষ্ট চেষ্টা করিয়া বলিল—

বিজয়: দু'ম।

কার্তিক: আজ্ঞে?

বিজয়: চিকা চিকা বুম নয়—চিকা চিকা দুম।

যে ব্যক্তি এমন গুরুতর পতনের পরও রসিকতা করিতে পারে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। কার্তিক শ্রদ্ধাভরে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিল। এই সময় তরুণী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তরুণী: বেশী লাগেনি তো?

তরুণীকে দেখিয়া বিজয় মুখ গম্ভীর করিল।

বিজয়: বিশেষ কিছু নয়, পা মচকে গেছে।

কার্তিকের স্কন্ধে ভর দিয়া সে সন্তর্পণে পা বাড়াইল।

কার্তিক : কিছু ভাববেন না স্যার, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কোন দিকে আপনার বাড়ি স্যার?

বিজয় : নেবুতলার দিকে।

বিজয় আর এক-পা অগ্রসর হইল; তরুণী তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

তরুণী : দেখুন, আমার একটা কথা শুনবেন? আমার গাড়িতে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

বিজয় ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়া উদাসকণ্ঠে বলিল—

বিজয় : ধন্যবাদ, আমি হেঁটেই বাড়ি পৌঁছুতে পারব, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

তরুণী : আপনার বাড়ি নেবুতলায় তো? আমি ঐদিক দিয়েই কলেজ যাই, আপনাকে শুধু নামিয়ে দিয়ে যাব।

বিজয় তরুণীর প্রতি একটি শুষ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিজয় : আপনার অসীম দয়া। কিন্তু একজন অপরিচিতকে এত অনুগ্রহ কেন করছেন, বুঝতে পারছি না।

তরুণী : (ঈষৎ হাসিয়া) হয়তো একটু স্বার্থ আছে। জানেন তো মেয়েদের কৌতূহল বেশী হয়। আপনার চাকরীর কি হল জানবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে।

বিজয় : ও তা সে তো এককথায় বলা যায়—

তরুণী : না না এখানে নয়—গাড়ীতে—

বিজয় আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না—কার্তিক ও তরুণীর সাহায্যে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। গাড়ি চলিয়া গেল। কার্তিক কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর দীর্ঘ শিস্ দিয়া বলিল—

কার্তিক : চিকা চিকা বুম্।

কাট্।

চলন্ত মোটরে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। বিজয়ের পশ্চাদ্ভাগে একটা কিছু ফুটিতেছিল, সে সেটা বাহির করিয়া দেখিল একখানা ইংরেজি বই। বিরসমুখে সে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। তরুণী স্মিতনয়নে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তরলকণ্ঠে বলিলেন—

তরুণী: একটা কথা বলবেন? আপনি বিদ্বান লোক, না? অন্তত বি-এ পাশ করেছেন।

বিজয়: বি এ পাশ করলে যদি বিদ্বান হয়, তবে আমিও বিদ্বান। কিন্তু বুঝলেন কি করে?

তরুণী: (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) বই দেখলে আপনার মুখের ভাব বদলে যায়।—কিন্তু যাক, আপনার চাকরীর কি হল বলুন।

বিজয়: কি আর হবে—যা আশা করেছিলুম তাই! আপনার বাবা এবং আর একজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হল, তারপর চলে এলুম।

তরুণী কিছুক্ষণ কথা বলিলেন না, তারপর সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

তরুণী: আমি খুশী হয়েছি।

বিজয় ভ্রূকুটি করিয়া তরুণীর দিকে চাহিল, তাহার মুখে ক্রমে একটা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিজয়: খুশী হয়েছেন। তা তো হবেনই। চাকরী পেলে গরীবের অন্নসংস্থান হত, কিন্তু তাতে আপনার কি আসে যায়! (তরুণী হাসিলেন)—হাসছেন! অর্থাৎ এত আনন্দ হয়েছে যে, চেপে রাখতে পারছেন না। এই ড্রাইভার, গাড়ী থামাও আমি এখানেই নাম্‌ব।

তরুণী: কেন, আপনার বাড়ি এসে পড়ল?

বিজয়: না, কিন্তু আমি হেঁটেই যেতে চাই। আমার পা এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মহেশ গাড়ির গতিবেগ হ্রাস করিয়াছিল, তরুণী মুচ্‌কী হাসিয়া বলিলেন—

তরুণী : থামাবার দরকার নেই মহেশ।—আপনি তো ভারি রাগী লোক ; আমি খুসী হয়েছি বলে আমার গাড়িতেই আর থাকবেন না ! রাগ না করে খুশীর কারণটা জিগ্যেস করলেও তো পারতেন।

বিজয় উত্তর না দিয়া গোঁজ হইয়া বইয়ের পাতায় চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। তরুণী মিটি মিটি হাসিলেন।

তরুণী : কি পড়ছেন এত ? ওটা গল্প উপন্যাসের বই নয়। খোঁচা দিবার সুযোগ পাইয়া বিজয় মুখ তুলিল।

বিজয় : না, ইকনমিক্‌সের বই। কিন্তু আপনার এ বই পড়বার কি দরকার ? আপনার পড়া উচিত কবিতার বই, রূপকথার বই—

তরুণী : তাও পড়ি। এটা কলেজের পাঠ্য কিনা, তাই পড়তে হয়। কিন্তু ওকথা যাক, আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, সামান্য চাকরীর জন্যে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো ?

বিজয় : কি করতে বলেন ? চুরি-ডাকাতি ?

তরুণী : চুরি-ডাকাতি আর গোলামী ছাড়া জীবিকা উপার্জনের আর কি পথ নেই ?

বিজয় : আর কি আছে আপনিই বলুন।

তরুণী : ব্যবসা আছে—স্বাধীন ব্যবসা ?

বিজয় ক্ষণেক কৃপাপূর্ণনেত্রে তরুণীকে পরিদর্শন করিল।

বিজয় : অর্থনীতির ছাত্রীর পক্ষে আপনার কথাটা একটু—ইয়ে হয়ে গেল। ব্যবসা—স্বাধীন ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই, বুঝেছেন ? মূলধন।

তরুণী : বুঝেছি।

সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিজয় নিজ পকেটে হাত দিল।

বিজয়ঃ আমার কত মূলধন আছে জানেন?—পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া সে তরুণীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

বিজয়ঃ এই দেখুন, এক টাকা সাড়ে তিন আনা আমার মূলধন। আমার পারিবারিক অবস্থাটাও তাহলে খুলে বলি—বাড়িতে মা আছেন, আর আমি। দাদা মফঃস্বলে সেরেস্তাদারের কাজ করেন, মাসে মাসে টাকা পাঠান। তাতেই খরচ চলে। আজ মাসের সাতাশে অর্থাৎ আরও চারদিন এই এক টাকা সাড়ে তিন আনায় আমাকে সংসার চালাতে হবে। (টাকা পকেটে রাখিয়া) এখন কি বলেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট, কেমন?

তরুণী কিন্তু মোটেই দমিয়া গেলেন না, বরং কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বিজয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বিজয়ঃ ও আপনার হাসি পাচ্ছে। আমার দারিদ্র্যের ইতিহাস আপনার হাসির খোরাক জুগিয়েছে—ভাল। আচ্ছা, নমস্কার। এই ড্রাইভার—

তরুণী হাসি থামাইয়া বিজয়ের বাহু স্পর্শ করিলেন।

তরুণীঃ আপনি বড় উল্টো বোঝেন। হাসলুম কেন জানেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার জন্যে এক টাকা সাড়ে তিন আনা শুধু যথেষ্টই নয়—অপর্যাপ্ত।

বিজয়ঃ ও—তাই নাকি?

তরুণীঃ হ্যাঁ। এখন আপনাকে একটা গল্প বলি—শুনুন।

বিজয়ঃ এর পরেও গল্প বলবেন? (হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া) বেশ, বলুন।

বিজয় পিছনে ঠেস দিয়া বসিল। তরুণীর মুখে গাম্ভীর্য; তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তরুণীঃ আমাদের দোকানটা আজ দেখলেন তো—বেশ বড়

দোকানই বলতে হবে, প্রায় দশ লাখ টাকার কারবার। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমার ঠাকুরদা এই মনোহর ভাণ্ডারের পত্তন করেছিলেন। তখন তাঁর মূলধন ছিল—আট আনা।

বিজয় : —আট আনা ?

তরুণী : হ্যাঁ। অনেকবার দাদুর মুখে গল্প শুনেছি। ভারী গরীব ছিলেন, কলকাতা শহরে মাথা গোঁজবার যায়গা ছিল না। প্রথমে এক উড়িয়ার দোকানে তেলে-ভাজা বিক্রি করতেন আর তার দোকানের বারান্দায় পড়ে থাকতেন। ক্রমে আট আনা পয়সা জমল, তখন তিনি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করলেন : চুলের কাঁটা, কাপড় কাচা সাবান, ছেলেদের কাঠের খেলনা—এই সব সস্তা জিনিষ বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়াতেন।

বিজয় বিস্ফারিত নেত্রে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল। তরুণী একটু হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অবরুদ্ধ আবেগে বাষ্পোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তরুণী : আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এতটা কৃচ্ছসাধন কি করে সম্ভব হল। কিন্তু আমার দাদু জীবনে কখনও মিছে কথা বলেন নি ; সত্যিই এসব কাজ তিনি করেছিলেন। দুর্জয় সাহস ছিল তাঁর, আর ছিল স্বাধীনতার দুর্দম পিপাসা। পরের গোলামী করে জীবন কাটাবার মতো মনের দীনতা হীনতা তাঁর ছিল না—

বিজয় : আপনার বৃদ্ধ দাদু তো ভারী তেজী লোক ছিলেন।

তরুণী : যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় দাদু বৃদ্ধ ছিলেন না, আপনারই মত নব-যুবক ছিলেন।

বিজয় : আর লজ্জা দেবেন না, তারপর বলুন—

তরুণী : তখন দাদুর দৈনিক আহারের খরচ ছিল চার পয়সা—

যেদিন লাভ না হত, সেদিন একবেলা খেতেন। এমনি করে দীর্ঘ দু-বছর ধরে একটি একটি করে টাকা জমতে লাগল। শেষে দু-শো টাকা জমল। তখন দাদু ছোট্ট একটি সিঁদুর-কৌটোর মত দোকান খুললেন—নাম দিলেন মনোহর ভাণ্ডার। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছরে সেই মনোহর ভাণ্ডার আজ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তরুণী গোপনে চোখ মুছিলেন। শেষে বিজয় তরুণীর দিকে ফিরিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিল—

বিজয়ঃ ধন্যবাদ। আপনার দাদু বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতুম।

তরুণীঃ কিন্তু—দাদু বেঁচে আছেন। (কুণ্ঠিতস্বরে) অনেক বয়স হয়েছে, তাই বাবার হাতে দোকানের ভার দিয়ে কাশীবাস করছেন—

বিজয় তরুণীর পানে চকিতে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মনে হইল তরুণীর মনে যেন একটু ক্ষোভ আছে, যেন তাঁহার দাদু দোকানের ভার তাঁহার পিতার হস্তে অর্পণ করায় তিনি সুখী নন।

বিজয়ঃ ও'—আচ্ছা, এবার আমাকে সত্যিই নামতে হবে। ঐ যে সামনে গলিটা, ওটা আমার গলি—

তরুণীঃ মহেশ, বাঁ-দিকের গলি।

বিজয়ঃ না না, মোড়ের ওপর নামিয়ে দিলেই হবে। ও গলিতে আপনার গাড়ি ঢুকবে না—

তরুণীঃ খুব ঢুকবে।

মোটর গলিতে ঢুকিল।

বিজয়ঃ ঐ যে পাঁচরঙা বেড়ালের মত বাড়িটা, ওর দোতলায় আমি থাকি—

গাড়ি দাঁড়াইল। বিজয় রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই হাত যোড় করিল। তাহার পায়ের বেদনা প্রায় দূর হইয়াছে।

বিজয় : ধন্যবাদ—অনেক অনেক ধন্যবাদ।

তরুণীও সহাস্যে দুই করতল যুক্ত করিলেন।

তরুণী : গল্প মনে থাকবে তো ?

বিজয় : থাকবে।

কাট্

দুইটি ঘর লইয়া বিজয়ের বাসা। সদর ঘরটির একমাত্র আসবাব একটি তক্তপোষ; দিনের বেলায় ইহা বসিবার ঘর, রাত্রে বিজয়ের শয়নকক্ষে পরিণত হয়। দেয়াল চিত্রাদি বাহুল্যবর্জিত, কেবল একটি এস্রাজ তক্তপোষের পিছনের দেয়ালে ঝুলিতেছে; মনে হয় ঘরের নিরাভরণ দীনতা দেখিয়া অভিমানী সৌখীন যন্ত্র গলায় দড়ি দিয়াছে।

তক্তপোষের উপর বিজয়ের দাদা প্রতাপবাবু কাৎ হইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখে একটি রূপার পান-কৌটা। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; নাদুস-নুদুস্ চেহারা; দিনে প্রায় একশ খিলি পান খান; চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলেন। তিনি যে সদ্য বিজয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ, একটি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগ মেঝেয় রাখা রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রমাণ তাঁহার জননী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতেছেন।

জননীটি বাঙলাদেশের বহুলক্ষ বর্ষীয়সী বিধবা জননীর মতই, শান্ত ভীরু পুত্রমুখাপেক্ষী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁহার মুখে অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। উপার্জনক্ষম স্বাধীন বিবাহিত পুত্রকে ভয় করিয়া চলেন না, এমন জননী বাংলাদেশে কয়টি আছেন ?

প্রতাপ পান-কৌটা হইতে কয়েকটি খিলি মুখে দিয়া খানিকটা চুণ আঙুলের ডগায় তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ : এক দিনের ছুটি; তা একটু যে জিরোবো, তার কি যো আছে। সারারাত ট্রেনে হট্টরাতে হট্টরাতে আসতে হল। গরজ

আমারই কিনা মা; তোমাদের আর কি বল না। মাস গেলে মাসোহারার টাকা আসে—ব্যাস্—নিশ্চিন্দি। সেই টাকা যে আমাকে গায়ের রক্ত জল করে রোজগার করতে হয়, তা তো আর তোমরা ভাব না—

মা: বাবা প্রতাপ—

প্রতাপ: থাক মা, তুমি যা বলবে, আমি জানি। কিন্তু আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো। লাখপতি নই, ছা-পোষা মানুষ, তবু এই চার বছর খরচ দিয়ে তোমাদের কলকাতায় রেখেছি। কিসের জন্যে? আখেরের কথা ভেবেই না? (চুণ মুখে দিলেন) যা হোক, বিজয় বি-এ পাশ করল, ভাবলুম খরচ সার্থক হল, এবার বুঝি সে পয়সা রোজগারে মন দেবে। হায় হরি, কোথায় কি। তিন মাস হয়ে গেল বিজয়ের কোন গুজরই নেই। বৌ তো সেই কথাই বলে —'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' কিন্তু মা, আমিই বা দুটো সংসার কদ্দিন ঘাড়ে করে থাকি? নিজের সংসারটি কম নয়—দিন দিন মা-ষষ্ঠির কৃপায় বেড়েই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, আজ নয় কাল তার বিয়ে দিতে হবে। আমি একা কোন্ দিক সামলাই? তুমিই বল তো, বিজয়ের কি উচিত নয় চাকরি-বাকরি করে আমাকে দুপয়সা সাহায্য করা? তা সাহায্য চুলোয় যাক, নিজের আর তোমার ভারটাও সে নিতে পারল না। তাকে বি-এ পাশ করিয়ে কি লাভটা আমার হল তাহলে?

মা: ঠিক কথাই বলেছ বাবা প্রতাপ—কিন্তু সে চুপ করে বসে নেই। পাশ করার পর থেকে রোজ সকাল বিকেল চাকরির খোঁজে বেরোয়—

প্রতাপ: মা, তোমার কোলের ছেলেটি যা বলে, তাই তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি তো আর ঘাস খাই না। তিন মাস ধরে

চাকরি খুঁজলে কলকাতা শহরে চাকরি পাওয়া যায় না? তা নয়, দাদার ভাতে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে—কি দরকার ওর জোয়াল ঘাড়ে নেবার? যতদিন এইভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে, ততদিনই ভাল—এই আর কি।

মা: না বাবা প্রতাপ, বিজয় তেমন ছেলে নয়—সে সত্যিই কাজের চেষ্টা করছে—

প্রতাপ: যাকগে মা, তুমি বুঝবে না যখন বলে লাভ কি? মোট কথা, এবার আমি একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। বৌ বলে, 'ঢের করেছ ঢের করেছ—আর কেন? নিজের অপোগণ্ডদের দিকেও তো তাকাতে হবে। ভাই তো আর স্বর্গে বাতি দেবে না।'

মা কিছু না বলিয়া কেবল চক্ষু মুদিলেন।

দ্বারের কাছে শব্দ হইল; ভেজানো দ্বার ঠেলিয়া বিজয় প্রবেশ করিল। প্রতাপকে দেখিয়া স্মিত-বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি আসিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বিজয়: দাদা—তুমি কখন এলে?

প্রতাপ চৌকীর উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিলেন। দুই ভাইয়ের অনেকদিন পরে দেখা—প্রতাপের মুখে কিন্তু বিজয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল না। গম্ভীর মুখে দুখিলি পান তুলিয়া লইয়া তিনি মুখে দিলেন।

প্রতাপ: আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি, কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কার বাড়ীতে আড্ডা জমেছিল?

বিজয় অবাক হইয়া দাদার মুখের পানে তাকাইল, তাঁহার প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিল না।

বিজয়: আড্ডা?

প্রতাপ: হ্যাঁ হ্যাঁ—কিসের আড্ডা বসেছিল? তাসের না গানের?

বিজয়ের মনের ভিতরটা শক্ত হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে জানিত কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

বিজয়: তাস-পাশা গান-বাজনার কি সময় আছে দাদা, চাকরির খোঁজে বেরিয়েছিলুম।

প্রতাপ যে বিশ্বাস করিলেন না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পাইল।

প্রতাপ: অ—! তা যোগাড় হল কিছু?

বিজয়: কিছু অপমান, কিছু উপদেশ, আর কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এছাড়া কিছুই যোগাড় হল না। একদল আছে তারা লেখা পড়া জানা লোক চায় না। আর এক দল চায় ত্রিশ টাকা মাইনেতে এম এ, পি আর এস।—কাজেই আমার চাকরী জুটবে কোত্থেকে?

প্রতাপ বিরক্তভাবে পানকৌটা তুলিয়া পকেটে পুরিলেন।

প্রতাপ: হুঁ। কিন্তু আমি তো মুখ্যুও নই,—এম্, এ, পি আর এস-ও নই—আমার চাকরী জুটেছিল কি করে?

মা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথা কহিলেন—

মা: বাবা প্রতাপ, আমি একটা কথা বলি। তুমি তো বাবা ভাল চাকরী করচ, সরকারী চাকরী করছ,—তা তুমি বাবা ওকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে নাও না—

প্রতাপ স্তম্ভিত বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া এমন ভাবে মায়ের পানে তাকাইলেন যে ভয়ে মায়ের বুক শুকাইয়া গেল।

প্রতাপ: মা! তুমি মা হয়ে এই কথা বললে! আমার চাকরিটাও খাবে? হুজুর যদি জানতে পারেন—আর জানতে পারবেনই—যে

আমি নিজের ভাইকে অফিসে ঢুকিয়েছি তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! সেই দিনই আমার চাকরি যাবে।

মা: (ভয়ে) না না, তাহলে কাজ নেই বাবা—আমি বুঝতে পারিনি।

প্রতাপ কিন্তু একটা সূত্র পাইয়াছেন, সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়; তাঁহার কথার ভঙ্গী আরও নাটকীয় হইয়া উঠিল।

প্রতাপ: কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি নিজের অফিসে ওকে ঢোকাব! ছেলেপুলের হাত ধরে আমাকে পথে দাঁড় করাতে চাও তোমরা!

মায়ের নিগ্রহ দেখিয়া বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

বিজয়: যাকগে দাদা, আমি ঠিক করেছি চাকরী করব না।

প্রতাপ তাঁহার বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টি বিজয়ের দিকে ফিরাইলেন; বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া চলিল—

বিজয়: আমি ব্যবসা করব—স্বাধীন ব্যবসা। দাদা, চাকরি পেলেও আমি রাখতে পারব না—পদে পদে লাঞ্ছনা আর অপমান, ও আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভাল, যত সামান্যই হোক, তবু তো কারুর গোলামী করতে হবে না—

প্রতাপের তাম্বুলপূর্ণ মুখ এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার হাঁ হইয়া গেল।

প্রতাপ: ব্যবসা—তুমি স্বাধীন ব্যবসা করবে!

বিজয়: হ্যাঁ দাদা, তুমি অনুমতি দাও, আমার মন বলছে আমি পারব।

প্রতাপ: পাগল তুমি—মাথা খারাপ! একটি চাকরি যোগাড় করতে পার না, তুমি ব্যবসা করবে! রামছাগলে চড়বার ক্ষমতা নেই, তুমি ঘোড়ায় চড়বে! কে এসব কুবুদ্ধি দিয়েছে তোমাকে?

বিজয়: কুবুদ্ধি নয়, এতদিনে আমার সুবুদ্ধি হয়েছে। মিছে

কলাস চাকরি চাকরি করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি—ও কাজ আমার নয়। দাদা, তুমি অমত কোরো না আমি ব্যবসা করব। দেখো, যদি লক্ষ্মী কোনও দিন আমাদের ঘরে আসেন, ব্যবসার পথ দিয়েই আসবেন।

প্রতাপ: পাগল, উন্মাদ—মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার। ব্যবসা করতে হলে মূলধন চাই, তার খবর রাখো?

বিজয়: জানি মূলধন চাই। কিন্তু আমার বেশী মূলধন দরকার নেই দাদা। তুমি আমাকে পাঁচশো টাকা দাও, তাতেই আমি কাজ আরম্ভ করতে পারব—

অতর্কিত পদাঘাতে ফুটবল যেমন লাফাইয়া ওঠে, প্রতাপ তেমনি ছিটকাইয়া চৌকী হইতে মেঝেয় নামিলেন।

প্রতাপ: কী বললে তুমি! পাঁচশ' টাকা! আমি তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব আর তুমি ব্যবসা করবে। উঃ, খুনে সব—খুনে! মা, শুনলে তোমার আদুরে ছেলের কথা? আমাকে জবাই করতে চায়—

বিজয়: দাদা, এমনি না দাও, ধার বলে দাও—আমি তোমার টাকা ফেরৎ দেব—

প্রতাপ: মাথায় পা দিয়ে আমায় ডোবাতে চায়। না—আর এখানে নয়। (ব্যাগ তুলিয়া লইয়া) ইষ্টিশানে বসে থাকব, তবু এখানে নয়। আমাকে ফতুর করতে চায়! পাঁচশ টাকায় একটা মেয়ের বিয়ে হয়, সেই টাকা আমি লুটিয়ে দেব! মা, আমি চললুম—

মা ছেলের ব্যাপার দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন; বিজয় আসিয়া প্রতাপের হাত ধরিয়া ফেলিল।

বিজয়: দাদা! তোমার পায়ে ধরছি বোসো এসে, এমন করে চলে যেও না। পাঁচশ' টাকা না দিতে পার, যা পার দিও। দু'শো টাকা—

প্রতাপ : দু'শো টাকা ! দু'পয়সা দেবনা আর তোমাকে। অনেক দোহন করেছ, আর নয়। এখন আমাকে কাটলে রক্ত নেই, কুটলে মাংস নেই। আমি গেরস্ত মানুষ, খেটে খাই ; তুমি ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, ঘোড়দৌড় খেল—আমি কিছুতে নেই তোমার, আজ থেকে তুমি আলাদা, আমি আলাদা। মা, এই পেন্নাম করছি তোমাকে ; তোমার আদুরে গোপালকে নিয়ে থাকো, আমার কাছে আর কিছু পিত্যেশ কোরো না—চললুম।

বিজয় : দাদা—

বিজয় আবার তাঁহার হাত ধরিল, তিনি ঝটকা মারিয়া হাত ছাড়াইয়া ব্যাগ হস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

মা : প্রতাপ ! ওরে অমন করে চলে যাসনি বাবা—

মা দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রতাপ আর ফিরিলেন না। বিজয় ক্লান্ত ভাবে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

মা : বিজয়, কি সর্ব্বনাশ করলি রে ! প্রতাপ যে সত্যিই চলে গেল। যা—ওকে ধরে নিয়ে আয়।

বিজয়ের ক্লিষ্ট মুখে একটা কঠিন হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয় : কি হবে মা, দাদা আর আসবে না। একটা ছুতো খুঁজছিল, সেই ছুতো পেয়ে চলে গেল।

মাও বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছিলেন ; তিনি একান্ত অসহায় ভাবে চৌকিতে গিয়া বসিলেন।

মা : কিন্তু কি হবে বিজয় ?

বিজয়ের শিরদাঁড়া এবার সোজা হইয়া উঠিল।

বিজয় : কী আর হবে ? তুমি ভয় পেয়োনা মা, এ ভালই হল যে দাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেল—দাদার উপর নির্ভর করে এতদিন যেন মনে কোনও জোর[illegible]চ্ছিলুম না। আজ আমি স্বাধীন, আজ

আমাকে নিজের অন্ন নিজে সংগ্রহ করতে হবে। ভগবান শরীরটা দিয়েছেন, আর কিছু না পারি, মুটে-মজুরের কাজ তো পারব।

মায়ের চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল পড়িতে লাগিল।

মা: তুই চাকরি করবি না? ব্যবসাই করবি?

বিজয়: হ্যাঁ মা, ব্যবসাই করব। আজ একটা বড় সুন্দর উদাহরণ পেয়েছি। খাটব—মুটেগিরি করব—বেগুনি ফুলুরি বিক্রি করব। তোমার ছেলে আর ভদ্রলোক থাকবে না মা, ভদ্রতার মুখোস তার খসে গেছে। এমনি করে একটি একটি করে টাকা জমাব; তারপর যখন দুশো টাকা জমবে তখন ছোট্ট একটি দোকান খুলব—সেই দোকান ক্রমে বড় করে তুলব—

মা: দুশো টাকা পেলেই তুই দোকান খুলতে পারবি?

বিজয়: পারব, একটু টানাটানি হবে কিন্তু পারব। একটি ছোট্ট দোকান ঘর দেখছি—

মা বিজয়ের বাহুর উপর কম্পিত হাত রাখিলেন।

মা: বিজয়, আমার মুখের দিকে তাকা। ঠিক বলছিস পারবি এ কাজ করতে? ভুল করছিস না?

বিজয়: না মা, আমার অন্তর্যামী বলছেন আমি পারব। তুমি পায়ের ধুলো দাও, তোমার পায়ের ধুলো কখনও নিষ্ফল হবে না।

বিজয় মায়ের পদধূলি লইল; মা তাহার চিবুকে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

মা উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন, বিজয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। মা তোরঙ্গ খুলিয়া একটি ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি বাহির করিলেন; পুঁটলির মধ্যে একটি সিন্দুর কৌটা ও সেকেলে ধরণের ভারী সোনার হার ছিল। হারটি তুলিয়া লইয়া মা বিজয়ের হাতে দিলেন।

মা: আমার শেষ গয়না। তোর বৌকে দেব বলে রেখেছিলুম।

তা তুই-ই নে, বিক্রি করলে দু'শো টাকার বেশীই হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মীর জন্যে তোলা গয়না যেন মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে।

বিজয়: মা।

দুর্দম আবেগে বিজয় মাকে জড়াইয়া ধরিল।

ফেড আউট্।

ফেড্ ইন।

হপ্তা দুই অতীত হইয়াছে।

বেলা অনুমান দশটা। ধনেশের অফিসঘরে নীলাম্বর ও ধনেশ খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছেন। জানালা দিয়া রাস্তার অপর পারে ভাড়াটে দোকান ঘরগুলি দেখা যাইতেছে; একটি দোকান ঘরের দ্বার খোলা, মাথার উপর সাইন্-বোর্ড ঝুলিতেছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার। দ্বারের নিম্নার্ধ তক্তা দিয়া ভরাট করিয়া কাউণ্টার তৈয়ার হইয়াছে। ঘরের ভিতরটা যতদূর দেখা যায় পণ্যদ্রব্যে ভরা।

নীলাম্বর তাচ্ছিল্যভরে আনুনাসিক হাস্য করিলেন।

নীলাম্বর: কার কপাল পুড়েছে কে জানে—আমাদের দোকানের সামনে দোকান খুলেছে!

ধনেশ নীলাম্বরের দিকে ফিরিলেন; দেখা গেল তাহার হাতে একটি অর্দ্ধভুক্ত আপেল রহিয়াছে।

ধনেশ: বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আস্পর্ধা কম নয়, মনোহর ভাণ্ডারের সামনে দোকান খোলে!

নীলাম্বর: পিঁপড়ের পালক উঠেছে। ভেবেছে মনোহর ভাণ্ডার ছেড়ে লোকে ঐ ফোতো দোকানে জিনিষ কিনতে যাবে! দু'দিনে বাছাধনকে ঘটি-বাটি বিক্রি করে পালাতে হবে।

ধনেশ নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

ধনেশ: আবার দোকানের নাম রাখা হয়েছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার! যেন মা-লক্ষ্মীর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঐ এঁদো কুঠুরীতে গিয়ে ঢুকবেন! হাঃ!

দ্বারে সশঙ্ক হস্তের টোকা পড়িল; একটি কেরানী কবাট ঈষৎ ফাঁক করিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

কেরানী: হুজুর—

আপেলে দংশনোদ্যত ধনেশ ভ্রূকুটি করিয়া আপেল টেবিলে রাখিলেন।

ধনেশ: কি চাও?

সাহস পাইয়া কেরানী দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটি ফাইল।

কেরানী: আজ্ঞে রায় বাহাদুর, বকেয়া বিলের হিসেব আমাকে করতে দেওয়া হয়েছিল—তা ক'রে এনেছি।

নীলাম্বর জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু একবার নাচিয়া উঠিল। ধনেশ অভ্যাসমত তাঁহার পানে তাকাইলেন।

নীলাম্বর: হিসেব—ও—তা এখন কেন? অন্য সময় আমাকে দেখালেই তো হ'ত। সব কাজ যদি রায় বাহাদুরই করবেন তাহলে আমি রয়েছি কি করতে?

কেরানী দোকানের পুরানো লোক; হিসাব-নিকাশে পোক্ত বলিয়া নীলাম্বর তাহাকে তাড়াইতে সাহস করেন নাই: কেরানীও অবস্থা [বুঝি]য়া সাধ্যমত মালিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে; অথচ নীলাম্বরের [দাপা]ন্ত দাপটে বেশী কথা বলার সাহসও তাহার হয় না। সে অধর [লেহ]ন করিয়া কাঁচুমাচু ভাবে বলিল—

কেরানী : আজ্ঞে, তা—যেমন হুকুম করেন। আপনারা দু'জনেই আছেন, তাই ভাবলুম—

হঠাৎ ধনেশের সুবুদ্ধি হইল ; তিনি যে হিসাব-নিকাশে কাঁচা নহেন তাহাও বোধ করি কেরানীকে দেখাইতে চাহিলেন—

ধনেশ : নিয়ে এস দেখি—কী হিসেব করেছ।

কেরানী ত্বরিতে আসিয়া টেবিলের উপর ফাইল মেলিয়া ধরিল ; ফাইলের মধ্যে অনেক পুরাতন বিল ও হিসাবের কাগজপত্র রহিয়াছে।

কেরানী : এই যে হুজুর—(হিসাবের কাগজ দেখাইয়া) এতগুলি বিল আদায় হয়নি—সবসুদ্ধ বকেয়া পড়েছে পঁচিশ হাজার ন'শো ছিয়াশী টাকা পাঁচ আনা—

বকেয়ার পরিমাণ শুনিয়া ধনেশ সক্রোধে টেবিলের উপর এক কিল মারিলেন ; অর্ধভুক্ত আপেলটা থেঁতো হইয়া গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধনেশ গর্জ্জন ছাড়িলেন—

ধনেশ : কী—পঁচিশ হাজার টাকা বাকী ! কেন আদায় করনি তুমি ?

কেরানী : আজ্ঞে রায় বাহাদুর, আমি একাউণ্ট ক্লার্ক—হিসেবের কেরানী। বিল আদায়ের জন্যে অন্য লোক আছে—

ধনেশ : (নরম হইয়া) ও—আচ্ছা, তোমাকে ক্ষমা করলুম। কিন্তু এত টাকা বাকী থাকে কেন ? নীলাম্বর !

নীলাম্বরের চক্ষু একবার স্ফুরিত হইল, কিন্তু তিনি সহজ কণ্ঠেই বলিলেন—

নীলাম্বর : বড় কারবারে দশ বিশ হাজার বকেয়া থাকেই—দেনাতেও থাকে পাওনাতেও থাকে। Business মানেই তো credit—credit না থাকলে কি বড় business চলে ? মনোহর ভাণ্ডার

তো আর ঐ (জানালা দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখাইলেন) পুঁচকে দোকান নয় যে দু'টাকা বকেয়া পড়লেই দেউলে হয়ে যাবে! (কেরানীকে) তুমি যেতে পার।

কেরানী ফাইল গুটাইয়া লইয়া দ্বার পর্য্যন্ত গেল, তারপর দ্বিধাভরে ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—

কেরানী: হুজুর, আমি পুরোনো চাকর, অনুমতি হয় তো বলি—বড়কর্ত্তার আমলে পাঁচ হাজার টাকার বেশী বকেয়া থাকত না—কর্ত্তা বলতেন—

ধনেশ চোখ পাকাইয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইলেন।

ধনেশ: যাও—

কেরানী আর দ্বিধা না করিয়া বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইল।

নীলাম্বর মৃদু কণ্ঠে হাস্য করিলেন—

নীলাম্বর: বড় কর্তার আমল— !

তিনি আবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার দুষ্ট চক্ষুটি কয়েকবার নাচিয়া উঠিল।

জানালার ভিতর দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখা যাইতেছে।

কাট্।

ক্যামেরা রাস্তা হইতে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের বহির্ভাগ পরিদর্শন করিয়া দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ঘরটি ছোট, কিন্তু নূতন পণ্যদ্রব্যে পরিপাটিরূপে সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি কাঁচের শো-কেস, তাহার মধ্যে এসেন্সের শিশি প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। শো-কেসটি প্রায় চার ফুট উঁচু; তাহার মাথার উপর একটি ঝুঁটা ফুলের ফুলদানী ও একটি প্লাষ্টারের ক্ষুদ্র ভীনাস ডি মিলো শোভা পাইতেছে। ঘরের এক

কোণে একটি ছোট টেবিল ও টুল—টেবিলের উপর হিসাবের নূতন খাতাপত্র। ঘরের অন্য কোণে একটি কুলুঙ্গির মধ্যে গণেশের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, কুলুঙ্গির ভিতর হইতে মৃদু মৃদু ধূপের ধুঁয়া বাহির হইতেছে।

বিজয় যোড়হস্তে গণেশ মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, চক্ষু মুদিত করিয়া অত্যন্ত ভক্তিভরে বিড়্ বিড়্ করিয়া বোধ করি সিদ্ধিদাতার স্তবস্তুতি করিতেছে। স্তোত্র শেষ হইলে কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বিজয় চোখ খুলিল। তারপর কাউণ্টারের দিকে ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল একটি লোক তাহার কাউণ্টারের দিকে আসিতেছে। সে দ্রুত সেই দিকে ধাবিত হইল—ঐ বুঝি তাহার প্রথম খদ্দের আসিতেছে।

ছাতা হস্তে একটি ভদ্রলোক হন্তদন্তভাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে আসিতেছেন। কাউণ্টারে পৌঁছিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে দোকানের ভিতর গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। বিজয় সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল—

বিজয়ঃ আসতে আজ্ঞে হোক—কী চাই আপনার ?

ভদ্রলোকঃ শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—অফিসের দেরী হয়ে গেছে—

বিজয়ঃ কি চাই বলুন এখুনি দিচ্ছি।

ভদ্রলোকঃ আরে মশাই ক'টা বেজেছে ? ঘড়ি কৈ আপনার ?

বিজয়ঃ ঘড়ি ! ঘড়ি তো নেই।

ভদ্রলোকঃ (খিঁচাইয়া) দোকান করেছেন আর একটা ঘড়ি রাখতে পারেন নি। খুব দোকানদার তো আপনি। মিছি মিছি আমার দেরী করিয়ে দিলেন।

ছাতা বগলে চাপিয়া ভদ্রলোক ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বিজয় কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চমকিয়া উঠিল।

বিজয়ঃ ঘড়ি! ঠিক। দোকানে ঘড়ি রাখা দরকার। ক'টা বেজেছে দেখতে এসে লোকে জিনিষ কিনে ফেলতে পারে (দেয়ালের দিকে চাহিয়া) ঐখানে ঠিক কাউণ্টারের সামনে—

বিজয় টেবিলের কাছে ফিরিয়া গিয়া একটি খাতায় ঘড়ির কথাটা নোট করিয়া রাখিল। কালই সে দেওয়ালে ঘড়ি টাঙাইবে, যেন ভুল না হয়। বেশ বড় গোছের—

কাউণ্টারে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া বিজয় খাতা ফেলিয়া ছুটিয়া গেল। আবার নূতন খদ্দের আসিয়াছে।

বিজয়ঃ এই আসছি—

আসিয়া দেখিল একটি মহিলা কাউণ্টারের ওপারে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে একটি আনি কাউণ্টারের উপর ঠুকিতেছেন। মহিলাটি নিশ্চয় মোটরে আসিয়াছেন, কারণ তাঁহার মুখখানি একটি কালো জালের motor veilয়ে ঢাকা। বিজয় আসিলে তিনি চোখ না তুলিয়াই আনিটা কাউণ্টারের উপর ফেলিয়া দিয়া নির্ব্যক্তিক কণ্ঠে বলিলেন—

মহিলাঃ একটা পেন্সিল—

বিজয়ঃ পেন্সিল, এই যে দিচ্ছি—

বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মহিলা সচকিতে চোখ তুলিলেন, তারপর মুখের পর্দা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে বিজয়ের পানে চাহিলেন।

মহিলাঃ একি আপনি।

এবার বিজয়ও মহিলাকে চিনিতে পারিল, এ সেই তরুণী অর্থাৎ রায় বাহাদুর ধনেশ রায়ের কন্যা। বিজয়ও উত্তেজনা-বিহ্বল কণ্ঠে তরুণীর প্রতিধ্বনি করিল—

বিজয়ঃ একি আপনি!

দু'জনের মুখেই বিস্ময় পুলকিত হাসি, যেন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটিয়াছে। তরুণী মহা কৌতূহলভরে দোকানের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—

তরুণী : আপনি সত্যিই দোকান করেছেন! এত শীগ্‌গির—উঃ আমার যে কী আশ্চর্য্য লাগছে—

বিজয় : (কৃতজ্ঞ স্মিত মুখে) আপনার জন্যেই তো হ'ল। গল্প বলেছিলেন মনে নেই? আপনার দাদুর গল্প।

তরুণী : সেই গল্প মনে করে রেখেছিলেন? আমি তো ভেবে-ছিলুম পরদিনই ভুলে গেছেন। আচ্ছা আমি যদি আপনার দোকানের ভেতরে আসতে চাই তাহলে কি আপনার খুব আপত্তি হবে? ভেতরটা বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

বিজয় : (মহা আগ্রহে) আসবেন—দেখবেন? আসুন—আসুন—ঐ যে বাঁ দিকে দরজা।

বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়া পাশের একটি সরু দরজা খুলিয়া দিল, তরুণী ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

নূতন দোকানের নূতন জিনিষপত্র তরুণী সহর্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন; খেলাঘর পাতিয়া বালিকাদের বুঝি এমনিই আনন্দ হয়।

তরুণী : বাঃ! কী সুন্দর! কী চমৎকার—

বিজয় : (কুণ্ঠিত বিনয়ে) এ আর কী দোকান। অতি ছোট —অতি সামান্য—

তরুণী : শিশু যখন জন্মায় তখন ছোটই থাকে; তাই বলে তাকে কেউ কম ভালবাসে না। সেই ছোট শিশুই ক্রমে বড় হয়। আপনার দোকানও বড় হবে।

বিজয় : আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

তরুণী বিজয়ের পানে চাহিয়া হাসিলেন।

তরুণী : আপাতত অন্য কিছু পড়লে ভাল হয়। চকোলেট আছে?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিল।

বিজয় : চকোলেট তো আনা হয়নি—ভুল হয়ে গেছে।

তরুণী : আনিয়ে রাখবেন। মহিলা খদ্দের যদি চান, চকোলেট রাখা নিতান্ত দরকার।

বিজয় : নিশ্চয় রাখব। কালই আমি—

শো-কেসের উপর তরুণীর দৃষ্টি পড়িল। ভীনাসের অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি তাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রতি একটা চকিত ভৎর্সনার কটাক্ষ হানিয়া তরুণী শো-কেসের ভিতরের জিনিষগুলো পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তরুণী : ঐ এসেন্সের বড় শিশিটা দেখি।

বিজয় এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া দিল; শিশিটি নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার ঘ্রাণ লইয়া তরুণী বলিলেন—

তরুণী : এটা আমি নিলুম। কত দাম?

দাম এখনও বিজয়ের কণ্ঠস্থ হয় নাই, সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—

বিজয় : দাম? এঁ—দেখি একবার শিশিটা—

শিশির নীচে সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা ছিল, তা দেখিয়া বিজয় মনে মনে হিসাব করিল।

বিজয় : ইয়ে—দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

বিজয়ের হাত হইতে শিশি লইয়া তরুণী নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখিলেন, টাকা বাহির করিতে করিতে বলিলেন—

তরুণী : দর তো বেশ সস্তা আপনার—ওমা!

ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিতে গিয়া তরুণী দেখিলেন মাত্র তিন টাকা কয়েক আনা আছে।

তরুণী : (ঈষৎ লজ্জিতভাবে) টাকা তো নেই। আচ্ছা, আমি পরে এসে নিয়ে যাব।

তিনি এসেন্সের শিশি ব্যাগ হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বিজয় তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—

বিজয় : না না, আপনি নিয়ে যান, দাম পরে দেবেন।

তরুণী চোখ তুলিয়া সকৌতুকে হাসিলেন।

তরুণী : ধারে জিনিষ দেবেন? কিন্তু অচেনা লোককে ধারে জিনিষ দেওয়া ভাল নয়।

বিজয় : কি যে বলেন, আপনি আবার অচেনা কিসের?

তরুণী : অচেনা নয়? বলুন দেখি আমার নাম কি?

প্যাঁচে পড়িয়া গিয়া বিজয় আম্‌তা-আম্‌তা করিল।

বিজয় : নাম অবশ্য জানি না—কিন্তু—

তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তরুণী : আপনি দেখছি এখনও দোকানদারী কিচ্ছু শেখেন নি। আসুন, কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। বকেয়া খাতা করেছেন তো—Credit Account Book?

বকেয়া খাতা যে রাখা দরকার তাহা বিজয়ের খেয়াল হয় নাই কিন্তু সে বুদ্ধি করিয়া কয়েকটা মোটা মোটা খাতা কিনিয়া রাখিয়াছিল, এখন তরুণীর কাছে অপদস্থ হইবার ভয়ে সে বলিয়া উঠিল—

বিজয় : বকেয়া খাতা! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বৈকি! এই যে-দেখুন না—

টেবিলের কাছে গিয়া সে একটা মোটা খাতা দেখাইল। তরুণীর চক্ষু চাপা কৌতুকে নৃত্য করিতেছিল, কিন্তু তিনি মুখে গাম্ভীর্য আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—

তরুণী : বেশ। লিখুন—আজকের তারিখ দিন—(বিজয় খাতায় লিখিতে লাগিল) হ্যাঁ, এক শিশি এসেন্স···দাম সাড়ে পাঁচ টাকা··· খাতকের নাম কুমারী লক্ষ্মী দেবী—

নাম শুনিয়া বিজয় কতক হতবুদ্ধি কতক বিস্ময় বিহ্বলভাবে মুখ তুলিল ; তাহার হাতের পেন্সিল পড়িয়া গেল।

বিজয় : কী—কী বললেন আপনার নাম ! লক্ষ্মী দেবী !

লক্ষ্মী হ্যাঁ। কেন পছন্দ নয় নামটা ?

বিজয় : না না, তা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য ! আমি যে আমার দোকানের নাম রেখেছি লক্ষ্মী ভাণ্ডার !

লক্ষ্মী : তা বেশ তো। অত ভয় কিসের ? আমি আপনার দোকানের মালিকানা স্বত্ব দাবী করব না।

বিজয় : তারপর দেখুন, আপনিই আমার দোকানের প্রথম খরিদ্দার —আশ্চর্য যোগাযোগ নয় ?

লক্ষ্মী : ভারি আশ্চর্য। আচ্ছা, চললুম আজ ; নামটা আশা করি ভুলবেন না, খাতায় টুকে রাখবেন। যদি ভোলেন আপনারই ক্ষতি।

বিজয় : দোকানদার হয়ে খদ্দেরের নাম ভুলে যাব—কখনই না ! আপনিও আশা করি আপনার নামের দোকানটি ভুলবেন না। কালই আমি চকোলেট আনিয়ে রাখব।

লক্ষ্মী : (হাসিয়া) আচ্ছা, তাহলে নমস্কার।

বিজয় : নমস্কার। ওঃ একটু দাঁড়ান।

বিজয় ছুটিয়া গিয়া আবার তখনি ফিরিয়া আসিল।

বিজয় : এই নিন আপনার পেন্সিল—

লক্ষ্মী : ধন্যবাদ, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

বিজয় : কিছু যদি মনে না করেন একটি কথা জিগ্যেস করি।

আপনার নিজের অত বড় দোকান থাকতে এই ছোট দোকানে পেন্সিল কিনতে এসেছিলেন যে !

লক্ষ্মীর মুখ একটু ম্লান হইল।

লক্ষ্মী : আমাদের দোকানে আজকাল আর কম দামের জিনিষ বিক্রী হয় না। আচ্ছা, আজ আসি।

অনতিদূরে মোড়ের কাছে লক্ষ্মীর মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাতে গিয়া উঠিল। বিজয় কাউণ্টারের উপর ঝুঁকিয়া হাত নাড়িল ; মোটর চলিয়া গেল।

বিদায়ের পালা শেষ করিয়া বিজয় দেখিল একটি বৃদ্ধ কখন অলক্ষিতে কাউণ্টারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইনি আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ, সাজ-পোষাকেও ঠিক তেমনিই আছে। তিনি চকিতের ন্যায় একবার চশমা তুলিয়া বিজয়কে দেখিয়া লইলেন, তারপর সদর্পে কাউণ্টারের উপর একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া কড়া স্বরে বলিলেন—

বৃদ্ধ : এক পয়সার নস্যি।

বিজয় : (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে নস্যি ? এই যে দিচ্ছি—

বৃদ্ধ : মাদ্রাজী নস্যি—এক নম্বর।

বিজয় : আজ্ঞে তাই দিচ্ছি।

তাক হইতে টিনের কৌটা নামাইয়া বিজয় আন্দাজমত এক পয়সার নস্য কাগজে মুড়িয়া বৃদ্ধকে দিল।

বৃদ্ধ : আসল মাদ্রাজী বটে তো ?

টিনের কৌটাটি বৃদ্ধের সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বিজয় সবিনয়ে বলিল—

বিজয় : আজ্ঞে, এক টিপ নিয়ে দেখুন, যদি আসল না হয় বদলে দেব।

বৃদ্ধ এক টিপ নস্য লইয়া অত্যন্ত তরিবতের সহিত নাকে দিলেন; বিজয় উদ্বেগ ভরে প্রতীক্ষায় রহিল।

বৃদ্ধ: হুঁ—ঠিক আছে।

বিজয় সহর্ষে হাত ঘষিল। বৃদ্ধ আর একবার চশমা তুলিয়া চকিতে তাহাকে দেখিয়া লইলেন।

বৃদ্ধ: নতুন দোকান করেছ?

বিজয়: (বিনীত হাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই প্রথম দিন।

বৃদ্ধের অধরোষ্ঠ নিঃশব্দে নড়িতে লাগিল, যেন তিনি কিছু স্বগতোক্তি করিতেছেন; তারপর হঠাৎ কোনও কথা না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

একটি বছর চারেকের শিশু হাতে পয়সা লইয়া আসিল, কাউণ্টার পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছায় না, পয়সাটি উঁচু করিয়া ধরিয়া সে বলিল—

শিশু: এক পয়সার লবঞ্চুস্ দাও না।

বিজয় হাত বাড়াইয়া পয়সা লইয়া হাসিমুখে বলিল—

বিজয়: কিসের লবঞ্চুস্ নেবে খোকা? নেবুর না কলার?

ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বালক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল।

শিশু: কলা—কলা—

ডিজল্ভ।

রিমঝিম বর্ষণ রোমাঞ্চিত রাত্রি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া জানালার কাঁচ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। কলিকাতা নগরী তাড়াতাড়ি কাজকর্ম শেষ করিয়া এই মধুর রাত্রিটি উপভোগ করিবার জন্য ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়াছে।

লক্ষ্মীর শয়ন ঘরের দ্বার এখনও খোলা আছে। ঘরটি মাঝারি

আয়তনের; আরাম ও বিলাসের কয়েকটি মহার্ঘ উপকরণে শিল্পী-জনোচিত রুচির সহিত সজ্জিত! এক পাশে মেহগ্নির খাটের উপর যূথীশুভ্র শয্যা, অন্য পাশে বহু আয়নায় ঝল্‌মল্‌ একটি ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের উপর বিবিধ আকৃতির শিশি বোতল কাচপাত্রে প্রসাধনের নানা উপকরণ—

লক্ষ্মী শিথিল শয়ন-বস্ত্র পরিধান করিয়া শিঙার মেজ্‌’এর সম্মুখে বসিয়া আছে; বড় বড় দু’টো বৈদ্যুতিক গোলকের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া প্রাচীনা দাসী আহ্লাদী তাহার চুলে বিনুনি খুলিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে। ইহা আহ্লাদীর প্রাত্যহিক কার্য; লক্ষ্মীর চুলের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া তবে সেদিনের মত বুড়ীর ছুটি। লক্ষ্মীর মা ঠাকুরমা বাঁচিয়া নাই।

আহ্লাদীকে কেবল দাসী বলিলে তাহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। মনোহর ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর রায়ের যৌবনকালে সে দাসীরূপে এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল; তারপর অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সে এই পরিবারেই ভিৎ গাড়িয়া বসিয়াছে। ধনেশ রায়কে সে স্তন্য দান করিয়া মানুষ করিয়াছে, ধনেশের মা-মরা মেয়ে লক্ষ্মীও তাহার হাতেই বড় হইয়াছে। বুড়ী এই সংসারটিকে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখে। কিন্তু তাহার মুখের দাপটের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। তাহাকে একাধারে দাসী ও গৃহিনী বলা চলে। লক্ষ্মীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে; লক্ষ্মীও তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে এবং সুবিধা পাইলেই খুনসুড়ি করে।

আহ্লাদী চুল আঁচড়াইতেছে; লক্ষ্মী সকাল বেলার কেনা এসেন্সের শিশিটা পরম যত্ন সহকারে খুলিতেছে এবং নিজের মনে গুন গুন করিয়া

গান গাহিতেছে ! গানের সুরটি দেশ রাগিনীকে আশ্রয় করিয়া আছে, মাঝে মাঝে মিঞা-মল্লার তাহাকে ছুঁইয়া যাইতেছে—

লক্ষ্মী : বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা,
শিহর ভরা—তনু শীতল করা—

শিশি খুলিয়া লক্ষ্মী শিশির মুখে একটি স্প্রে-সিরিঞ্জ আঁটিয়া দিল, নিজের গায়ে মুখে এসেন্সের শীকরকণা ছড়াইল। তাহার চোখ দুটি স্বপ্নালু; আজ বর্ষার রাত্রে তাহার মনে কিসের ঘোর লাগিয়াছে।

লক্ষ্মী : উতল বায়ু গেল দুয়ারে কর হানি'
বিজলি-বধূরা দিল যে হাতছানি
হাসিয়া বলে গেল চোখের ইসারায়,
'সখি লো অভিসারে চলেছি মোরা,'—
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

কেশ প্রসাধন শেষ করিয়া আহ্লাদী বলিল—

আহ্লাদী : নে আর গান গাইতে হবে না। বিষ্টি বাদলের রাত, এবার শুয়ে পড়, আমায় ছুটি দে।

লক্ষ্মী : বিষ্টি বাদলের রাত বলেই তো গাইছি। কেমন গন্ধ বল্ তো দিদি ?

লক্ষ্মী আচম্কা বুড়ীর মুখে এসেন্সের স্প্রে দিল। বুড়ী রাগিয়া আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে ঝঙ্কার দিল—

আহ্লাদী : আঃ গেল ছুঁড়ি, রাত্তির বেলা কী না কী দিয়ে আমার মুখ ভিজিয়ে দিলি !

লক্ষ্মী : কেমন গন্ধ বল্ না ? আজ নতুন দোকান থেকে নতুন সেণ্ট কিনেছি।

আহ্লাদী : ছাই গন্ধ ! এ নাকি আবার গন্ধ ? মাখতে না মাখতে উপে যায়।—সেকালে আতর গোলাপ ছিল, তাকে বলি গন্ধ ! একদিন

মাখলে সাতদিন খোসবো থাকত। তোর ঠাকুরমা মাখতো—সে কি আজকের কথা।

লক্ষ্মী : ঠাকুমাকে তোর মনে আছে ?

আহ্লাদী : ওমা, মনে থাকবে না! বিয়ে হয়ে তিনি ঘর করতে এলেন, আর আমিও তাঁর ঝি হয়ে এ বাড়িতে ঢুকলুম। তা তিনি তো আর বেশী দিন রইলেন না, ধনেশকে জন্ম দিয়েই স্বগ্‌গে গেলেন। আমি পোড়া কপালীই পড়ে রইলুম!

লক্ষ্মী : তা তুইও ঠাকুমার সঙ্গে স্বগ্‌গে গেলেই পারতিস্‌!

আহ্লাদী : (মুখ নাড়া দিয়া) আমি স্বগ্‌গে গেলে তোর ঠাকুর্দার সেবা করত কে, ধনুকে মানুষ করত কে? তোকে এত বড়টা করতো কে ?

লক্ষ্মী : তুই বুঝি ঠাকুমা মারা যাবার পর দাদুর খুব সেবা করতিস ?

আহ্লাদী : হ্যাঁ, করতুমই তো—আমি ছাড়া তাঁর সেবা করবার আর ছিলই বা কে?—নে এবার উঠ্‌বি, না সারা রাত রহলা করবি আমার সঙ্গে ?

লক্ষ্মী : তুই ছাড়া আর যে কেউ নেই, কার সঙ্গে রহলা করি? দিদি, বিদ্যাপতির গান শুনেছিস—

ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ?

আহ্লাদী : (চোখ পাকাইয়া) আবার গান! আজ তোর কী হয়েছে বল্‌ দেখি ?

লক্ষ্মী : আজ আমাকে গানে পেয়েছে—

লক্ষ্মী আবার গাহিয়া উঠিল। এবার গানের ছন্দ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—চপল নৃত্য চটুল ছন্দ—কিন্তু সুর তাহাই আছে—

লক্ষ্মী : বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।
বিজন ঘরে কুহু রাতে
মোর কাজল ধুয়ে গেল আঁখিপাতে—
মরম কাঁদে বঁধু-পিয়াসাতে।

আহ্লাদী কোমরে হাত রাখিয়া মুখের বিরক্ত ভঙ্গী করিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, কিন্তু তাহা মুখভঙ্গী দ্বারাও স্বীকার করিবে না।

লক্ষ্মী : বিরহিণী আমি, ও পূববী,
কেন আমার বুকে—ভরে দিলে
কদম বনেব, বকুল বনের, কেয়ার বনের ঐ সুরভি ?
কেন কেড়ে নিলে নয়নে ঘুম
কেন ঢেলে দিলে অঝোর-ঝোরা !
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

গান শেষ হইলে আহ্লাদী নাক সিঁটকাইয়া বলিল—

আহ্লাদী : আ মরে যাই, কী গানের ছিরি! বিরহিণী—বিরহিণী! আইবুড়ো মেয়ে, তুই আবার বিরহিণী কিসের লা ?

লক্ষ্মী : কেন, আইবুড়ো মেয়েকে বিরহিণী হতে নেই ?

আহ্লাদী : মাথা নেই মাথা ব্যথা। ওঠ্ শুবি চল্।

লক্ষ্মীর চোখে দুষ্টামি নৃত্য করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী : আচ্ছা দিদি, আজ এমন বাদলার রাত, তোর কারুর জন্যেও মন কেমন করছে না ?

আহ্লাদী : পোড়া কপাল, আমার কে আছে যার জন্যে মন কেমন করবে ?

লক্ষ্মী : (নিরীহভাবে) কেন, দাদুর জন্যে! দাদু কদ্দিন হ'ল কাশী

চলে গেছেন, তোকে সঙ্গে নিয়েও গেলেন না—তা তোর একটু মন কেমন করা উচিত।

আহ্লাদী চোখ বড় বড় করিয়া কিছুক্ষণ· তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা হাতলযুক্ত চুলের বুরুশ তুলিয়া লইয়া লক্ষ্মীকে মারিতে আসিল।

আহ্লাদী : তবেরে ফাজিল ছুঁড়ি—

লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গিয়া খাটের কিনারায় বসিল, আহ্লাদী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল—

আহ্লাদী : তোর যা মুখে আসবে বলবি আমাকে? কেন? কিসের জন্যে? তোর দাতুর সঙ্গে আমার কী লা?

লক্ষ্মী : তা কি করে জানব! কিন্তু দাতু কাশী গিয়ে অবধি তোর মেজাজ বড্ড খারাপ হয়েছে দিদি—টিকে ধরিয়ে নেওয়া যায়।

আহ্লাদী : অ্যাঁ—আবার! ওমা একি আতন্তরে পড়লুম গা—বুড়ো বয়সে আমার এই কলঙ্ক! মুখে একটু আট্‌কালো না তোর? আমি না তোর বাপ্‌কে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি?

লক্ষ্মী : সেই জন্যেই তো মনে হয় দিদি, তুই যেন ঠিক আমার আপন ঠাকুমা।

আহ্লাদী এবার মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল, কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—

আহ্লাদী : ওরে, তেমন কপাল কি আমি করেছিলুম! তোর ঠাকুর্দা যে সাধু নোক, দেব-তুল্যি মনিষ্যি; দাসাবাঁদীর পানে কি কখনও চোখ তুলে চেয়েছেন—?

বুড়ির বিলাপ শুনিয়া লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বিছানায় গড়াইয়া পড়িল! বুড়ি দেখিল, বেফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; সে উঠিয়া লক্ষ্মীর মশারি ফেলিতে ফেলিতে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল—

আহ্লাদী : বাপ্‌ঠাকুর্দাকে নিয়ে ঠাট্টা! আজকালকার মেয়েদের

কি লজ্জা আছে? ইস্কুলে পড়া—ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করা,—এই তো হয়েছে আজকাল!

নেটের মশারির ভিতর দিয়া লক্ষ্মীকে দেখা যাইতেছিল, সে মুখ টিপিয়া বলিল—

লক্ষ্মী: সত্যি দিদি।

আহ্লাদী মশারিব ধাব গুঁজিতে গুঁজিতে নিজ মনে বকিয়া চলিল—

আহ্লাদী: সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি! রসে যে ফেটে পড়ছেন একালের মেয়েরা! কোন্‌দিন তুই-ই হয়তো ইস্কুল থেকে এসে বল্‌বি, দিদি আমি পেমে পড়েছি!

লক্ষ্মী: সত্যি দিদি।

বুড়ি থামিয়া গেল; সন্দিগ্ধভাবে মশারির মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

আহ্লাদী: 'সত্যি দিদি' কি লা?

লক্ষ্মী: এই, কোন্‌দিন হয়তো ইস্কুল থেকে এসে বল্‌ব—দিদি, আমি প্রেমে পড়েছি।

মশারি তুলিয়া বুড়ি কট্‌মট্‌ করিয়া লক্ষ্মীর পানে তাকাইল।

আহ্লাদী: গলা টীপে দেব একেবারে। খবরদার ইস্কুলের ছোঁড়াদের কাছে ঘেঁষতে দিবিনে। ওদের সব পেটে-পেটে বজ্জাতি!

লক্ষ্মী: কিন্তু দিদি—মনে কর, একটি ছেলে—মানে একটি ছোঁড়া, যদি দেখতে বেশ ভাল হয়, আর তার স্বভাবটি খুব মিষ্টি হয়—? তবু তুই তাকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিবিনে?

বুড়ীর সন্দেহ-কঠোর মুখের ভাব মুহূর্তে বিগলিত হইয়া গেল, সে বিছানার উপর এক হাত রাখিয়া লক্ষ্মীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—

আহ্লাদী : হ্যাঁরে সত্যি লক্ষ্মী, সত্যি ভাল ছেলে? তোর মনে ধরেছে?—কী নাম রে তার?

লক্ষ্মী বাহু তুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

লক্ষ্মী : নাম? ঐ যা, নামটাই জানা হয়নি দিদি!

বুড়ী রাগ করিয়া গলা ছাড়াইয়া লইল; মশারি গুঁজিয়া কলহ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—

আহ্লাদী : বুঝেছি লো বুঝেছি—ঠাট্টা হচ্ছে। সব তাতেই ঠাট্টা। আমারই মরণ হয় তাই তোর কথায় বিশ্বাস করতে যাই। এই আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে চললুম, ঘুমতে হয় ঘুমো, নয়তো জেগে জেগে কড়িকাট গোন্—

বুড়ী বড় আলো নিভাইয়া দিয়া দ্বার ভেজাইয়া চলিয়া গেল। বেড্ সুইচ্ টিপিয়া লক্ষ্মী নৈশ দীপ জ্বালিল; ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল।

বাহিরে রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি ঝরিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভায় জানালার কাঁচ আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মী একাকিনী শয্যায় শুইয়া উর্দ্ধে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অবশেষে সে চুপি চুপি বলিল—

লক্ষ্মী : সত্যিই এখনও নাম জানি না—

ওয়াইপ্।

আর একটি কক্ষ; প্রায় নিরাভরণ। ঘরের কোণে মৃদু প্রদীপ জ্বলিতেছে। তক্তপোষের উপর বিজয় শুইয়া, তাহার মা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। বিজয়ের চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে কিন্তু মুখে অভিনব বিস্ময়ের আনন্দ এখনও লাগিয়া আছে!

বিজয় :······মা, তার নাম লক্ষ্মী······যখন তার নাম জানতুম না তখন সেই-ই আমায় দোকান করার বুদ্ধি দিয়েছিল······না জেনেই

দোকানের নাম রাখলুম লক্ষ্মী-ভাণ্ডার……আর আজ সেই লক্ষ্মী প্রথম আমার দোকানে জিনিষ কিনতে এল। কী আশ্চর্য বল তো?

মা একটু হাসিলেন।

মা: হাঁ বাবা, আশ্চর্য বৈ কি! এবার তুই ঘুমো।

মা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, বিজয়ের চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্। ৫

কিছুদিন পরের কথা। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। প্রাতঃকাল। মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে ফুটপাথের উপর কার্তিক ও তাহার দল মার্‌বেল খেলিতেছে।

দোকানের ভিতর হইতে নীলাম্বর বাহির হইয়া আসিলেন। হাতে ছড়ি, গলায় চাদর; বোধ হয় কোনও কাজে বাহির হইতেছেন।

নীলাম্বর অন্যমনস্ক ছিলেন; ফুটপাথে নামিয়াই কার্তিকের মার্‌বেলের উপর পা দিলেন। অমনি সড়াৎ।

দলের ছেলেরা যে যার মারবেল্ কুড়াইয়া লইয়া চম্পট দিল; নির্ভীক কার্তিক নীলাম্বরকে ধরিয়া তুলিতে গেল।

কার্তিক: আহাহা স্যার, পড়ে গেলেন! চিকা চিকা বুম্! উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন, কিছু লাগেনি—

ক্রুদ্ধ নীলাম্বর ফুটপাথে উপবিষ্ট থাকিয়াই কার্তিকের গালে একটি চপেটাঘাত করিলেন, তারপর লাঠিতে ভর দিয়া বিকৃতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

নীলাম্বর: হতভাগা নচ্ছার। চালাকি পেয়েছিস। হাজারবার

বলিনি আমার দোকানের সামনে গুলি খেলবিনে। আজ তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।

নীলাম্বর কার্তিকের নিতম্ব লক্ষ্য করিয়া ছড়ি চালাইলেন, কার্তিক লাফাইয়া পিছু হটিয়া গেল। আচম্বিতে চড় খাইয়া সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, কেবল আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিটুকু জাগ্রত ছিল; নীলাম্বর যে এই সামান্য কারণে এমন সংহারমূর্তি ধারণ করিবেন, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

নীলাম্বর হিংস্রভাবে লাঠি উঁচাইয়া কার্তিকের দিকে অগ্রসর হইলেন; কার্তিক পিছু হটিয়া ফুটপাথ হইতে নামিয়া রাস্তায় পড়িল।

নীলাম্বর: ছাল তুলে নেব তোর পিঠের, শূয়ারকা বাচ্ছা। ছোট-লোকের ছেলের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে!—

আবার তিনি ছড়ি চালাইলেন; এবারও কার্তিক পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিল। এইভাবে, কার্তিক পিছু হটিতে হটিতে এবং নীলাম্বর ছড়ি চালাইতে চালাইতে রাস্তা পার হইলেন। রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল।

রাস্তার পরপারে পৌঁছিয়া, ফুটপাথের কিনারায় কার্তিক ধোঁকা খাইল। পিছু দিকে হটিবার বিপদ আছে, ফুটপাথের কিনারায় পা আটকাইয়া সে পড়িয়া গেল। অমনি নীলাম্বর সপাং করিয়া তাহাকে এক ঘা ছড়ি মারিলেন।

নীলাম্বর: উল্লুক—হতভাগা—বজ্জাৎ—

হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পালাইবে কোন্ দিকে? সম্মুখেই বিজয়ের দোকান চোখে পড়িল; আর দ্বিধা না করিয়া সে এক লাফে কাউণ্টার ডিঙাইয়া একেবারে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বিজয় দোকানের মধ্যেই ছিল, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—

বিজয় : আরে একি ! কী হয়েছে ?

কার্তিক সভয়ে বিজয়ের কোমর জড়াইয়া ধরিল।

কার্তিক : ঐ দেখুন স্যার, আমাকে মারতে আসছে—

নীলাম্বর ততক্ষণে কাউণ্টারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; লাঠি ঠুকিয়া বলিলেন—

নীলাম্বর : বেরিয়ে আয় ছুঁচো কোথাকার। আজ তোর বাপের নাম ভুলিয়ে না দিই তো—

বিজয় নীলাম্বরকে চিনিতে পারিল ; ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর সে কার্তিকের বাহুমুক্ত হইয়া কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইল, দোকানদার-সুলভ বিনয়ের সহিত একটু ঝুঁকিয়া বলিল—

বিজয় : নমস্কার !—কি চাই আপনার ?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে বিজয়ের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন ; মুখখানা যেন চেনা-চেনা, কোথায় দেখিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু স্পন্দিত হইল।

বিজয় : (শুষ্ক হাসিয়া) চিনি চিনি মনে হচ্ছে অথচ চিনতে পারছেন না, কেমন ? না চেনারই কথা—আমার মত কত লোক চাকরির জন্যে আপনার কাছে যায়—

নীলাম্বর : (চিনিতে পারিয়া) তুমি—সেই তুমি !

বিজয় : হ্যাঁ, সেই আমি, সেই অপদার্থ worthless আমি। কিছু দরকার আছে কি ? কী চাই বলুন, আমার দোকানের দর খুব সস্তা।

কঠিন রিক্রপে নীলাম্বরের মুখ বক্র হইয়া গেল।

নীলাম্বর : তাই তো বলি, কার এত আস্পর্দ্ধা, মনোহর ভাণ্ডারের

সামনে দোকান খুলেছ—তুমি! চাকরির উমেদারী ছেড়ে এখন ব্যবসা আরম্ভ করেছ—?

বিজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ, শাস্ত্রেই তো আছে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

নীলাম্বরের দৃষ্টি সাপের মত বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

নীলাম্বর : খুব যে বুলি কপ্‌চাচ্ছ ছোক্‌রা! দোকানদারী ভারি মজা—না? মনোহর ভাণ্ডারের সঙ্গে টেক্কা দিতে এসেছ? আচ্ছা দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলেন। কার্তিক বিজয়ের পিছনে লুকাইয়া ছিল, উঁকি মারিয়া বলিল—

কার্তিক : চলে গেছে?

বিজয় তাহার দিকে ফিরিল।

বিজয় : হ্যাঁ। কি হয়েছিল রে?

কার্তিক বাহির হইয়া আসিল, বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া হস্ত আস্ফালন করিয়া বলিল—

কার্তিক : কিচ্ছু হয়নি স্যার, মিছিমিছি আমাকে থাব্‌ড়া মেরেছে, লাঠি মেরেছে। আপনিও তো স্যার গুলিতে পা পিছলে পড়ে গিছলেন, আপনি তো থাবড়া মারেন নি, আর ঐ যাচ্ছেতাই বুড়োটা—

বিজয় তাহার পিঠ চাপড়াইল।

বিজয় : যাক্‌গে, যেতে দে, বুড়ো হলে মানুষের মেজাজ একটু তিরিক্ষি হয়। তোর নাম কি?

কার্তিক কিন্তু শান্ত হইল না, মুষ্টি পাকাইয়া বলিল—

কার্তিক : আমার নাম কার্তিক স্যার, চাঁপাতলার ছেলে আমি। চড় মেরেছে আমাকে, আমিও দেখে নেব। এর শোধ না তুলতে পারি তো—টিকা টিকা বুম্!

এই সময় একটি খদ্দের আসিল।

খদ্দের : কাপড় কাচা সাবান।

বিজয় হাসিয়া কাউণ্টারের দিকে ফিরিল।

বিজয় : এই যে। কাটা সাবান না আস্ত—?

ডিজল্‌ভ।

দিন দুই তিন পরে। অপরাহ্ণ।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। পণ্যে ভরা বিশাল ঘরটিতে কোথাও শব্দ নাই, চাঞ্চল্য নাই—সমস্ত নিঝুম হইয়া আছে। কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছে। খরিদ্দার দোকানে একটিও নাই।

কাট।

মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখ। পথ দিয়া লোকজন গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করিতেছে।

মনোহর ভাণ্ডারের সদর দরজার পাশে একটা থামের আড়ালে কার্তিক দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটি টিনের কৌটায় খানিকটা সাবান গোলা জল, অন্য হাতে একটি খড়; কার্তিক অলস ভঙ্গীতে খড়ে ফুৎকার দিয়া বুদ্বুদ উড়াইতেছে, কিন্তু তাহার সতর্ক চক্ষু পথচারীদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে।

দোকানের সামনে একটি গাড়ি আসিয়া থামিল, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা অবতরণ করিলেন। কার্তিক টিন ও খড় রাখিয়া তাঁহাদের কাছে আসিল, মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিয়া বলিল—

কার্তিক : নমস্কার স্যার। বাজার করতে এসেছেন? সস্তায় ভাল জিনিষ কিনতে চান তো ঐ দোকানে চলে যান। ঐ যে

লক্ষ্মী ভাণ্ডার—নতুন দোকান স্যার; আনকোরা নতুন জিনিস পাবেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্মীভাণ্ডারের দিকে তাকাইলেন।

প্রৌঢ়: ঐ দোকান! ওতে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যাবে—

মহিলাটি কার্তিককে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহিলা: ও দোকানে ভাল চায়ের সেট পাওয়া যায়?

কার্তিক: আজ্ঞে একেবারে নতুন চালান, হরেক রকম ডিজাইন—একবার গিয়েই দেখুন না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি মহিলার দিকে চাহিলেন; মহিলা ঘাড় নাড়িলেন; তারপর দু'জনে রাস্তা পার হইয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে গেলেন। কার্তিকের মুখে ক্ষণিক বিজয়োল্লাস খেলিয়া গেল; সে ফিরিয়া গিয়া আবার নির্লিপ্তভাবে বুদ্বুদ উড়াইতে লাগিল।

কাট।

ধনেশের অফিস ঘর।

ধনেশ মুখ ভারি করিয়া টেবিলে বসিয়া আছেন এবং একটি আলপিন-কণ্টকিত পিনকুশন লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। আজ তাঁহার আপেলেও রুচি নাই। নীলাম্বর অত্যন্ত বিব্রতভাবে তাঁহার পিছনে পায়চারি করিতেছেন। জানালা বন্ধ আছে।

নীলাম্বর: কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিনে! দু'দিন থেকে দোকানে খরিদ্দার নেই! আমাদের রোজকার ক্যাশ বিক্রি প্রায় ছ'শো টাকা, কিন্তু কাল-পরশু একশো টাকাও পোরেনি!

ধনেশ: কেন এমন হবে! নিশ্চয় কোথায় গলদ আছে!

নীলাম্বর: সেই কথাই তো ভাবছি—কোথায় গলদ। (চক্ষু

নাচাইলেন) ঐ ব্যাটা লক্ষ্মী ভাণ্ডার কোনও প্যাঁচ মারছে না তো ? বলা যায় না। হয়তো মষ্টে মষ্টে খদ্দের ভাঙাচ্ছে।

ধনেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন।

ধনেশ : কী, এতবড় বুকের পাটা ! আমার সামনে দোকান করে আমার খদ্দের ভাঙাবে। জুতিয়ে লাশ করে দেব না ! নীলাম্বর, ডেকে পাঠাও হনুমান সিংকে।

হনুমান সিং দোকানের মাহিনা করা গুণ্ডা ; কর্তার আমলের লোক। দোকান করিতে হইলে বোধ করি এইরূপ বলবান প্রহরী দরকার হয়। নীলাম্বর কিন্তু ধূর্ত সাবধানী লোক, সহসা ফৌজদারী করিতে রাজি নন ; বলিলেন—

নীলাম্বর : না না, অত ব্যস্ত হলে চলবে না। আগে খোঁজ তল্লাস করে দেখা যাক, যদি ও ব্যাটা কিছু করে থাকে, তখন তো হনুমান সিং আছেই।

ধনেশ : আমি ওসব বুঝি না। আমার দোকানের আয় কমে যাবে কেন ? কৈফিয়ৎ চাই।

বলিয়া ধনেশ টেবিলের উপর কিল মারিলেন—কিল পড়িল পিনকুশনের উপর। 'উহুহু' বলিয়া ধনেশ হাত ঝাড়িতে লাগিলেন।

কাট্

ফুটপাথে একটি লোক বিলাতী কুকুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছেন। মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কার্তিক তাঁহাকে গিয়া ধরিল।

কার্তিক : একি স্যার, এমন কুকুর দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন ? ও—বুঝেছি, বগলস্ আর ছেকল কিনতে বেরিয়েছেন ? ব্যস্ সোজা ঐ দোকানে চলে যান—ভাল জিনিষ পাবেন—আপনার যেমন তেজী কুকুর, তেমনি মজবুত ছেকল পাবেন—

ব্যক্তি : কিন্তু মনোহর ভাণ্ডারে—

কার্তিক : মনোহর ভাণ্ডারে কি কম দামের জিনিষ পাওয়া যায় স্যার? চলে যান লক্ষ্মী ভাণ্ডারে, যা চাই তাই পাবেন জলের দরে।

লোকটি একটু ইতস্তত করিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকেই অগ্রসর হইলেন। কার্তিকের মুখে একটি কুটিল হাসি দেখা দিল, সে নীলাম্বরের অনুকরণে চক্ষু নামাইয়া হ্রস্বস্বরে বলিল—

কার্তিক : চিকা চিকা বুম্!

এই সময় লক্ষ্মী কলেজ হইতে ফিরিল; তাহার মোটর তাহাকে দ্বারের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মীর মুখে মোটর গুণ্ঠন; সে বাড়ির দিকেই পা বাড়াইতেই কার্তিক তাহাকে স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

কার্তিক : নমস্কার মিস্!—

এখন, কার্তিক লক্ষ্মীকে পূর্ব্বে কয়েকবার দেখিয়াছে কিন্তু সে যে মনোহর ভাণ্ডারের সহিত সম্পর্কিত তাহা অনুমান করিতে পারে নাই; তাছাড়া মুখের মোটরগুণ্ঠনও কিছু ভ্রান্তি ঘটাইয়াছিল। তাই কার্তিক তাহাকে শাঁসালো খরিদ্দার মনে করিয়া বেশ ভাল করিয়া ধরিল।

কার্তিক : কেন মিস্ আপনি এখানে জিনিষ কিনতে এসেছেন? এখানে ভাল জিনিষ কিস্সু পাওয়া যায় না—সব পুরোনো লজ্ঝড় মাল।

লক্ষ্মী পর্দ্দার ভিতর দিয়া কার্তিককে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিল; তাহার ভ্রূ একটু উত্থিত হইল।

লক্ষ্মী : তাই নাকি! তুমি তো সব জান দেখছি।

কার্তিক : আমি সব জানি মিস্—কোন দোকানে কী ভাল জিনিষ পাওয়া যায় সব আমার নখের ডগায়! কী চাই আপনার বলুন—পমেটম ক্রীম স্নো—চা কোকো—মোজা গেঞ্জি—

লক্ষ্মী : মনে কর আমি চকোলেট চাই—

কার্তিক : (মহোৎসাহে) চকোলেট্ ! এতক্ষণ বলেন নি কেন মিস্ ? ভাল তাজা চকোলেট—ঐ যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখছেন—স্রেফ ঐখানেই পাওয়া যায়। মনোহর ভাণ্ডারে যদি কিনতে যান পঞ্চাশ বছরের পুরোনো চকোলেট পাবেন।

লক্ষ্মীর অধরোষ্ঠ একটু শক্ত হইল, কিন্তু সে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবে বলিল—

লক্ষ্মী : ও—তা ঐ লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মালিকের সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে বুঝি ?

কার্তিক : আছে বৈকি মিস্, উনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আর ওঁর দোকানের দরও খুব সস্তা।

লক্ষ্মী ক্ষণেক চিন্তা করিল।

লক্ষ্মী : হুঁ—তোমার কথা শুনে হচ্ছে হচ্ছে ও দোকানে যাই, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে ?

কার্তিক : আল্‌বৎ নিয়ে যেতে পারব মিস্। আসুন আমার সঙ্গে—এখুনি বিজয় বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কার্তিক অগ্রগামী হইয়া লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে লইয়া চলিল।

কাট্

দোকানে কাজের ভিড় ছিল না ; এই অবকাশে বিজয় তাহার ভীনাস ও ফুলদানী লইয়া পড়িয়াছিল। শো-কেশের মাথার উপর ঐ দুটিকেই সাজাইতে হইবে, কারণ অন্য কোথাও সাজাইবার স্থান নাই ; অথচ ঐ দু'টা বিসদৃশ জিনিস কিছুতেই মানানসই ভাবে সাজানো যাইতেছে না। ফুলদানী ভীনাসের বাঁ দিকে রাখিলে ডান দিকটা ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, ডান দিকে রাখিলে বাঁ দিক শূন্য হইয়া যায়, সম্মুখে রাখিলে ভীনাসের মুখটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

শেষে বিরক্ত হইয়া বিজয় ফুলদানীটা ভীনাসের পিছনে বসাইয়া দিল। দেখা গেল, এ বরং মন্দ হয় নাই, ফুলদানীর রঙিন ফুলের পশ্চাৎপটে ভীনাসের শুভ্ররূপ আরও ভাল দেখাইতেছে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীকে লইয়া কার্তিক দোকানের মধ্যে উপস্থিত। সে একটু ভঙ্গী সহকারে একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—

কার্তিক: এই যে মিস্, ইনি বিজয়বাবু। স্যার, ইনি চকোলেট্ কিনতে এসেছেন।

বিজয় লক্ষ্মীকে দেখিয়া সহাস্যে আগাইয়া আসিল, পকেটে হাত দিয়া বলিল—

বিজয়: লক্ষ্মী দেবি, আপনার চকোলেট আমার পকেটেই রয়েছে।—কতদিন আসেন নি বলুন তো!

মুখের পর্দা তুলিয়া লক্ষ্মী বিজয়ের পানে তাকাইল। অধরে হাসি নাই; মুখ একটু গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ।

লক্ষ্মী: বিজয়বাবু—

কার্তিক একটু থতমত খাইয়া গেল,—ইহারা যেন পূর্ব হইতেই পরস্পরকে চেনে! লক্ষ্মীর উন্মুক্ত মুখ দেখিয়া তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, কোথায় যেন একটা হিসাবের ভুল হইয়াছে! কার্তিক আস্তে আস্তে পিছু হটিল। লক্ষ্মী বিজয়ের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

লক্ষ্মী: এই ছেলেটিকে কবে থেকে চাকর রেখেছেন?

বিজয়: (সবিস্ময়ে) চাকর রেখেছি-! কার্তিককে—?

বিজয় কার্তিকের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, কার্তিক দেয়ালী পোকার মত তেরছা ভাবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে ডাকিল—

বিজয় : কার্তিক, যাস্‌নে— দাঁড়া।

কার্তিকের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বড়ই অসুখী হইয়াছে; কিন্তু বিজয়ের আদেশ সে অবজ্ঞা করিতে পারিল না, ন যযৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয় : (লক্ষ্মীকে) কি হয়েছে বলুন দেখি।

লক্ষ্মী : ও আমাদের দোকান পিকেট্‌ করছিল—আর ও-দোকানের খদ্দের ভুলিয়ে এ-দোকানে পাঠাচ্ছিল। আমাকেও খদ্দের মনে করেই এখানে নিয়ে এসেছে।

প্রথমে খানিকক্ষণ অভিভূত থাকিয়া বিজয় এক লাফে গিয়া কার্তিকের ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিল।

বিজয় : (সক্রোধে) কার্তিক, হতভাগা, এ তুই কি করেছিস্‌? এ-কাজ করতে গেলি কেন? কে বলেছিল তোকে?

কার্তিক গোঁজ হইয়া রহিল উত্তর দিল না। লক্ষ্মীর মুখের মেঘ অনেকটা পরিষ্কার হইল।

লক্ষ্মী : তাহলে—আপনার হুকুমে করেনি?

বিজয় ভর্ৎসনাভরা চোখে তাহার পানে চাহিল।

বিজয় : আমার হুকুমে? আমাকে এত ছোট মনে করেন আপনি?

লক্ষ্মী লজ্জিত হইল; বাস্তবিক এমন অভদ্র সন্দেহ কেন সে করিতে গেল? লজ্জাবিব্রতকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মী : না না—কিন্তু ও তাহলে অমন করতে গেল কেন? অম্‌নি অম্‌নি?

দু'জনেই কার্তিকের দিকে তাকাইল; কার্তিক ঘাড় বাঁকাইয়া বিদ্রোহ ভরা কণ্ঠে বলিল—

কার্তিক : অমনি-অমনি নয় মিস্‌। আমাকে চড় মেরেছিল কেন—লাঠি মেরেছিল কেন?

লক্ষ্মী অবাক হইয়া বিজয়ের মুখের পানে তাকাইল, তারপর কার্তিককে প্রশ্ন করিল—

লক্ষ্মী : কে চড় মেরেছিল—লাঠি মেরেছিল ?

কার্তিক : ঐ দোকানের বুড়োটা—ঐ যে—

কার্তিক নীলাম্বরের অনুকরণে চক্ষু স্ফুরিত করিল।

বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল ; বিজয়ও মৃদু হাসিয়া কার্তিকের ঘাড় ছাড়িয়া দিল।

লক্ষ্মী : ও—নীলাম্বরবাবু তোমায় মেরেছিলেন তাই তুমি শোধ নিচ্ছিলে ? কিন্তু দোকান তো নীলাম্বরবাবুর নয়, দোকান আমার বাবার।

কার্তিকের মুখ-গোঁজ-করা বিদ্রোহের ভাব আর রহিল না, তাহার অধরে একটু অনুতাপ মিশ্রিত হাসি দেখা দিল—

কার্তিক : ভুল হয়ে গেছে মিস্—আর করব না।

লক্ষ্মী প্রসন্নভাবে ঘাড় নাড়িল। এই সময় কাউণ্টারে খদ্দেরের গলা শোনা গেল—

খরিদ্দার : এক প্যাকেট কাঁচি—

বিজয় সেদিক যাইবার উপক্রম করিতেহ কার্তিক চট্ করিয়া বলিল—

কার্তিক : আমি দিচ্ছি স্যার, কিছু ভাববেন না—আপনারা কথা বলুন।

কার্তিক ত্বরান্বিত হইয়া কাউণ্টারের দিকে চলিয়া গেল। বিজয় সেই দিকে তাকাইয়া রহিল—কার্তিক চালাক-চতুর ছেলে বটে, কিন্তু ভুল না করিয়া ফেলে।

লক্ষ্মী সরিয়া গিয়া শো-কেশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মিলোর চিরযৌবনা ভীনাস অচঞ্চল যৌবনশ্রী লইয়া দাঁড়াইয়া

আছে, অঙ্গহীনতার গ্লানি তাহার মদোদ্ধত দেহলাবণ্যকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। এই অলজ্জিত মূর্তির দিকে তাকাইয়া লক্ষ্মী ভ্রূকুটি করিল, বোধ হয় মনে মনে তাহাকে গালি দিল। তারপর বিজয়ের দিকে একটি চকিত দৃষ্টি হানিয়া চুপি চুপি ফুলদানীটি ভীনাসের সম্মুখে আনিয়া রাখিয়া দিল; ভীনাসের নগ্ন দেহ-সুষমা ঢাকা পড়িল।

ওদিকে কার্তিক নিপুণ তৎপরতার সহিত কাউণ্টারের কাজ চালাইতেছে দেখিয়া বিজয় ফিরিয়া লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চকোলেটের রূপালি পাতা-মোড়া তক্তা বাহির করিয়া বলিল—

বিজয়: এই নিন আপনার চকোলেট—

লক্ষ্মী লক্ষ্য করিল বিজয়ের মুখ হইতে আহত অভিমানের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বিগলিত অনুতাপের কণ্ঠে সে বলিল—

লক্ষ্মী: দোষ করেছি, আমায় মাপ্ করুন।

উদাসভাবে বিজয় চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিল।

বিজয়: না, দোষ আর কি? এরকম অবস্থায় সন্দেহ হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাকে আপনি কতটুকুই বা জানেন—মাত্র চারবার দেখা হয়েছে বৈ তো নয়।

লক্ষ্মী ধনী কন্যা, কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে অভ্যস্ত নয়; কিন্তু এই দরিদ্র দোকানদারটির নিকট সবিনয়ে নতি-স্বীকার করিতে তাহার একটুও বাধিল না। সে নম্রস্বরে বলিল—

লক্ষ্মী:—রাগ করবার অধিকার আপনার আছে, কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না? ক্ষমা চাইছি, তবু যদি আপনি রাগ করে থাকেন তাহলে—

লক্ষ্মীর গলা কাঁপিয়া গেল। বিজয়ের কানে তাহার কাঁপা-গলার

রেল পৌঁছিতেই সে বুঝিতে পারিল, কী ছেলেমানুষী সে করিতেছে। সে ঊর্দ্ধ হইতে চক্ষু নামাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—

বিজয়: ও কথা বলবেন না, লক্ষ্মী দেবী। রাগ আপনার ওপর আমি করতেই পারি না। জেনে রাখুন, আপনার প্রতি আমার মনে অসীম কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুরই স্থান নেই।

লক্ষ্মী কিন্তু মনে মনে খুশি হইতে পারিল না; বিমনা হইয়া ভাবিল অসীম কৃতজ্ঞতা কি এতই বড় জিনিস? তাহার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসীম কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই তুমি অনুভব কর না? কিন্তু সে হাল্কা হাসিয়া বলিল—

লক্ষ্মী: যাক নিশ্চিন্ত হলুম। আপনাকে যতই কম চিনি না কেন, আপনি যে রাগী মানুষ সেটা জানতে বাকি নেই। কিন্তু আপনাকেও একটা কথা জানিয়ে রাখি, দরকার হলে আমিও রাগ করতে জানি।

বিজয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিজয়: না না, কি মুস্কিল—আপনি রাগ করতে যাবেন কেন? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি? করেছি—বলুন?

লক্ষ্মী: করেছেন বৈকি। চকোলেট দেবেন বলে সেটি নিজের হাতেই রেখেছেন, প্রাণ ধ'রে দিতে পারছেন না।

সত্যই ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে চকোলেট বিজয়ের হাতেই রহিয়া গিয়াছিল, সে সলজ্জে উহা লক্ষ্মীর হাতে দিল। লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে চকোলেটের প্রান্তে একটু কামড় দিয়া বলিল—

লক্ষ্মী: এবার বলুন দোকান চলছে কেমন। তিন দিন আসতে পারিনি, নতুন খবর কিছুই জানি না।

বিজয় পরিতৃপ্ত মুখে হাসিল। তারপর তাহার মুখ একটু গম্ভীর হইল, সে সংযত স্বরে বলিল—

বিজয়ঃ আশাতীত ভাল চলছে। এত ভাল চলছে যে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি—

লক্ষ্মীঃ (অবাক হইয়া) সে কি রকম ?

বিজয় ভীনাসের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চাহিল। তাহার অবচেতনায় বোধ হয় একটা অসঙ্গতির ছায়া পড়িল, সে ফুলদানীটা ভীনাসেব পিছন দিকে সরাইয়া দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল—

বিজয়ঃ বোধ হয় পূজো আসছে তাই···জিনিষের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে, অথচ এইটুকু দোকানে অত জিনিস রাখ্‌বার যায়গা নেই তাই ভাবছি—

লক্ষ্মাঃ কী ভাবছেন ?

বিজয়ঃ ভাবছি, পাশের ঘরটা খালি আছে, ওটাও ভাড়া নিয়ে দোকানটাকে বড় করব কি না।

লক্ষ্মীঃ (সোৎসাহে) তাই করুন বিজয় বাবু—দুটো ঘর নিলে অনেকখানি যায়গা পাবেন; মাঝে দরজা আছে, কোনও অসুবিধা হবে না।

বিজয়ঃ অসুবিধা একটু আছে। দুটো কাউণ্টার হ'লে একজন লোক রাখতে হবে– আমি তো দুদিক দেখতে পারব না।

কাউণ্টারে খরিদ্দার ছিল না; কার্তিক কান পাতিয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। তাহার চক্ষুযুগল উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ দরকার হলে লোক নিশ্চয় রাখবেন। কাজ বাড়লে লোক তো রাখতেই হবে—

এবার লক্ষ্মী অন্যমনস্কভাবে ভীনাসকে ফুলদানী আড়াল করিল, বিজয় তাহা লক্ষ্য করিল না।

বিজয়ঃ বেশ, আপনিও যখন সায় দিচ্ছেন তখন আর কথা নেই। কিন্তু একজন বিশ্বাসী কাজের লোক চাই—

আলাদীনের প্রদীপের জিনের মত কার্তিক সহসা তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া স্যালুট করিল; তাহার দুই চক্ষু উত্তেজনায় জ্বলিতেছে।

কার্তিক: বিশ্বাসী কাজের লোক চান স্যার?—এই যে হাজির আছে।

কার্তিক নিজের বুকের উপর হাত রাখিল।

বিজয় ও লক্ষ্মী নবজাগ্রত কৌতূহল লইয়া কার্তিককে নিরীক্ষণ করিল, তারপর পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল।

বিজয়: তুই পারবি? দোকানের কাজ জানিস?

কার্তিক: চিকা চিকা বুম্—সব জানি স্যার! পগেয়া পটিতে আমার মামার মণিহারীর দোকান আছে। আমাকে একটিবার কাজ দিয়ে দেখুন।

বিজয়: আচ্ছা ভেবে দেখি। তুই কাউণ্টারে যা।

কার্তিক আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বিজয় তখন হ্রস্বকণ্ঠে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—

বিজয়: কি বলেন? রাখব ওকে? ছেলেটা চালাকচতুর আছে।

লক্ষ্মী স্মিতমুখে নেপথ্যে কার্তিকের পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল—

লক্ষ্মী: মন্দ কি! একটা সত্যিকারের কাজ পেলে ওর দুষ্টুবুদ্ধিও কমবে। ওকেই রাখুন বিজয়বাবু।

ওদিকে কার্তিক কাউণ্টারে মহা-উৎসাহে জিনিস বিক্রি করিতেছে—

কার্তিক: ···দেশলাই এক পয়সা, এই যে আসুন আপনার কি চাই?···রুলকাটা খাতা—দু'পয়সার না চার পয়সার? এই যে আসুন······শেলেট্ পেন্সিল্ পয়সায় দুটো······গেঞ্জি? আজ্ঞে আছে কালীঘাটের গেঞ্জি—

তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া লক্ষ্মী ও বিজয় হাসিল। তারপর হঠাৎ বিজয়ের চোখ পড়িল ভীনাসের উপর। ফুলদানীতে ঢাকা লজ্জাবতী ভীনাস! বিজয় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে তো ফুলদানী ভীনাসের পিছনে রাখিয়াছিল, কে সামনে আনিল? তাহার অবচেতনা ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আড়চোখে তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল।

লক্ষ্মী: আচ্ছা, আজ চললুম। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া লক্ষ্মী চলিয়া গেল। বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পিছনে চাহিয়া রহিল. তারপর তাহার চোখ ভীনাসের দিকে ফিরিল। রহস্যটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। আরে ছি ছি, ভীনাসের নগ্নতা এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে সে তাহা লক্ষ্যই করে নাই। আর লক্ষ্মী—।

বিজয় অনেকক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ডিজল্ভ।

মহা বাদ্যোদ্যমের শব্দ হইতেছে।

বিজয়ের দোকান দুইটি ঘরে বিস্তারলাভ করিয়াছে; সাইন বোর্ডটাও লম্বা হইয়া দুইটি দরজার উপর প্রসারিত হইয়াছে।

দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের উপর ভিড় জমিয়াছে। কাতিক ও তাহার দল অদ্ভুত ধরণের সাজ-পোষাক পরিয়া দোকানের সামনে কুচ-কাওয়াজ করিতেছে এবং নানা বিচিত্র বাদ্য বাজাইয়া গান করিতেছে। ফুল পাতা কলার থাম প্রভৃতি সময়োচিত মঙ্গল উপকরণ দ্বারা দোকান যথাযোগ্যভাবে সাজানো হইয়াছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার বড় হইয়াছে এই সংবাদটি এই অভিনব উপায়ে সাধারণের নিকট ঘোষিত হইতেছে।

গান চলিতেছে, বিলাতিমিশ্রিত কুচকাওয়াজী সুর—

চিকা চিকা বুম্।

আজ মরসুম্—আজ মরসুম্—

চিকা চিকা বুম।

ধনেশের অফিস ঘরের জানালা বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। ধনেশ ও নীলাম্বর দাঁড়াইয়া আছেন। নীলাম্বরের ললাটে কুটিল ভ্রূভঙ্গ; ধনেশ হিংস্রভাবে একটা আপেল কামড়াইতেছেন।

—এল পূজা—এল মা দশভূজা।

ঘরে ঘরে ধুম—

নতুন কাপড় জামা গয়নার ধুম—

চিকা চিকা বুম।

মনোহর ভাণ্ডারের দ্বিতলে একটি জানালায় লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নীচের দিকে চাহিয়া আছে।

—ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা এস লক্ষ্মী

বাংলার মৌচাকে মধু-লক্ষ্মী

এস লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রুমঝুমঝুম—

চিকা চিকা বুম।

রুজ পাউডার—আতর গোলাপ—

আলতা সিঁদুর মনভরপুর

পাবে মনের মতন—পাবে হরেক রকম—

চিকা চিকা বুম!

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধটি ভিড়ের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্মীর জানালাব দিকে তাঁহার নজর পড়িল। চট করিয়া চশমা তুলিয়া তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ফেড্ আউট্।

ফেড ইন্।

কলিকাতার একটি বড় চৌমাথায় প্রকাণ্ড পোষ্টার লাগানো হইয়াছে—

পূজার সময়—

রয়াল আফ্রিকান সার্কাস দেখুন।

হাতী, বাঘ, গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি বন্য জন্তুর সমাবেশে বিজ্ঞাপনটি বড়ই নয়নরঞ্জক হইয়াছে।

কাট্।

একটি বাড়ির দেয়ালে অপেক্ষাকৃত ছোট বিজ্ঞাপন—

ই, বি, আর—

পূজার ছুটিতে অর্দ্ধমূল্যে ভ্রমণ করুন।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সম্মুখে হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে—

পূজার বাজার—

নরম দরে গরম জিনিষ!

আসুন! দেখুন! কিনুন!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের প্রবেশ দ্বারের কবাট বন্ধ। তবু ক্যামেরা ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডিজল্ভ্।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর; দেয়ালে একটি বড় ক্যালেণ্ডার ঘোষণা করিতেছে—

রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর—

সুতরাং দোকানে কেহ নাই। দিনের বেলাও অন্ধকার; মাথার উপর একটি মাত্র বাল্‌ব জ্বলিতেছে, তাহার নিঃসঙ্গ আলোকে বিশাল ঘরটির মধ্যে আলো-আঁধারির খেলা।

ঘরের যে প্রান্তে উপরের সিঁড়ি তেরছাভাবে উঠিয়া দ্বিতলের দিকে গিয়াছে, সেই কোণে সিঁড়ির পাশের দিকে নীলাম্বর দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নীলাম্বরের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় না যে, তিনি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; তিনি খুব গলা খাটো করিয়া কথা কহিতেছেন এবং তাঁহার তাম্র চক্ষুদুটি সতর্কভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার সঙ্গীটি পশ্চিমী লোক; ইয়া ষণ্ডা চেহারা, ঝাঁকড়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ী, গলায় কালো সূতার কণ্ঠি। ইহার উল্লেখ পূর্বে আমরা শুনিয়াছি—মাহিনা করা গুণ্ডা হনুমান সিং।

নীলাম্বর: খুব সাবধানে কাজ করতে হবে হনুমান সিং, যেন কোনও রকম গণ্ডগোল না হয়—

হনুমান সিংয়ের গলাটি গাঁজার প্রসাদে ধরাধরা, খুব শ্রুতিমধুর নয়; সেও গলা নামাইয়া বলিল—

হনুমান: আরে বাবুজি, হামি পন্দ্র বরষ্ ই কাম কোরছে, আজতক্ হামার নাম পুলিশের বহিতে চঢ়েনি। বুঢ়া মালিকের মালুম ছিল। কী কাজ আছে বোলেন, তারপোরে দেখিয়ে লিবেন কেমন সিল্‌সিলাসে কাম হোয়। আমি দুকানের নৌকর আছে, মালিকের বদ্‌নাম কোভি হোতে দিবে না—

নীলাম্বর: বেশ বাবা হনুমান, ঐদিকে নজর রেখো; ধরি মাছ না ছুঁই পানি। এখন কি করতে হবে বলি—

এই সময় ক্যামেরা উর্ধ্বমুখ হইয়া উপর দিকে তাকাইল। দেখা গেল, লক্ষ্মী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। তাহার পায়ে ফেল্টের বেড্-রুম-স্লিপার, কোনও শব্দ হইল না। নীলাম্বর বা হনুমান কেহই ওদিক হইতে মানুষ সমাগম আশঙ্কা করেন নাই, তাই লক্ষ্মীর প্রতি কাহারও নজর পড়িল না।

লক্ষ্মীর হাতে একখানা বই ছিল, বোধ করি সে বইখানা পিতার অফিসে রাখিতে যাইতেছিল। কিন্তু নীচে মনুষ্য কণ্ঠের ফিস্ ফিস শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল—অল্প আলোতেও চিনিতে কষ্ট হইল না—নীলাম্বর ও হনুমান সিং। আজ রবিবার, দোকান বন্ধ—এ সময় ইহারা কি করিতেছে! ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া লক্ষ্মীর সন্দেহ হইল; সে নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর হনুমানের আরও কাছে সরিয়া আসিলেন।

নীলাম্বর : আমাদের সামনে একটা নতুন দোকান হয়েছে দেখেছ —লক্ষ্মী ভাণ্ডার ? ঐ লোকটা আমাদের পেছনে লেগেছে ; ওকে সায়েস্তা করা দরকার। লোকটাকে তুমি দেখেছ তো ?

হনুমান : হাঁ হাঁ, দেখিয়েছে—নৌযবান ছোকরা আছে। ওহি তো ?

নীলাম্বর : হ্যাঁ, ওই। ভারি শয়তান লোকটা। দেখছ না বুকের পাটা, আমাদের নাকের সামনে এসে দোকান খুলেছে ; তার ওপর আমাদের খদ্দের ভাঙিয়ে নিচ্ছে। ওকে তুমি ভাল করে জব্দ করে দাও দেখি, হনুমান। তুমি মাইনে তো পাচ্ছই, তার ওপর সাহেব তোমাকে মোটা বকশিশ, করবেন।

উপরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, সে বিহ্বল ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া আছে—

হনুমান : তো ই কোন্ ভারি কাম আছে! হুকুম হো তো উস্‌কো মুর্দা বানিয়ে দিবে।

নীলাম্বর : শোনো, সাহেব বলেছেন, একেবারে শেষ করে দেবার দরকার নেই। প্রথমটা ওকে একটা বড় রকম হুম্‌কি দাও ; ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, এ-পাড়ায় ওর দোকান করা চল্‌বে না।

হনুমান: আচ্ছা, হাম খুব আচ্ছি তরহসে সমঝিয়ে দিবে—হে হে হে—

নীলাম্বর: আস্তে—যদি ভালয় ভালয় পাড়া ছেড়ে চলে যায় তো ভালই—নইলে—

হনুমান: নহি তো পিছে একদম ছুনিয়াসে নিকাল-বাহার করিয়ে দিবে—

এই পর্যন্ত শুনিয়া লক্ষ্মী আর দাঁড়াইল না, পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে উপরে ফিরিয়া গেল।

নীলাম্বর: কিন্তু মনে থাকে যেন বাবা হনুমান, যাই কর, আমাদের জড়িও না। এমন ভাবে কাজ করবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

হনুমান: আরে বাবুজি, সে আপনি হামাকে কি বোলছেন? হনুমান সিং যার নিমক খাইয়েছে তার ইজ্জৎ বাঁচানেকে লিয়ে জান দিবে। আপনি কুচ্ছু ফিকির কোরেন না--

অতঃপর দুইজনে অতি সন্তর্পণে সদর দরজার দিকে চলিলেন।

কাট্।

নিজের শয়ন ঘরে শয্যার পাশে লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে; তার মনটা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। আজ এ কী শুনিল সে! বিজয়কে ইহারা গুণ্ডা লাগাইয়া তাড়াইতে চায়! প্রয়োজন হইলে খুন করিতে ইহারা পিছপাও নয়। তাহার বাবা—! না, না, সে কখনই ইহা ঘটিতে দিবে না।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লক্ষ্মী জানালার কাছে ছুটিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখিল, বিজয়ের দোকান খোলা আছে।

জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর

তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া বেশ-বাস পরিবর্তন করিতে লাগিল।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডার। দুইটি কাউণ্টারে যথাক্রমে কার্তিক ও বিজয় রহিয়াছে।

আমাদের পূর্ব পরিচিত বৃদ্ধ বিজয়ের কাউণ্টারের বাহিরে দাঁড়াইয়া 'নরম-গরম' বিজ্ঞাপনটি পড়িতেছেন, তাঁহার অধরোষ্ঠ ব্যঙ্গভরে একটু একটু নড়িতেছে। ভিতরে বিজয় তাঁহার জন্য এক মোড়ক নস্য লইয়া হাসিমুখে তাঁহার পানে বাড়াইয়া ধরিল।

বিজয়: আসুন—আপনার নস্যি। আর তো পুজো এসে গেল, বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে পুজোর উপহার কিছু কিনবেন না?

বৃদ্ধ মোড়ক লইয়া গলার মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিলেন।

বৃদ্ধ: বাড়ির ছেলেমেয়ে—!

বিজয়: আজ্ঞে হাঁ, এই সব ছোট ছোট নাতি নাতনী—

বৃদ্ধ: একটী নাতনী আছে, তার জন্যে কিছু কিনতে হবে—

বিজয়: আজ্ঞে আমি অনেক রকম ছেলেমেয়েদের খেল্‌না আনিয়ে রেখেছি—দেখবেন একবার? ভেতরে আসুন না—যদি কিছু পছন্দ হয়—

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া ক্ষণেক বিজয়কে দেখিলেন, তাঁহার গলায় আবার শব্দ হইল।

বৃদ্ধ: খেল্‌না! আমার নাতনীর বয়স উনিশ বছর—

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

বিজয়: ওঃ—মাপ্ করবেন, আমি ভেবেছিলুম—তা মহিলাদের

উপহার দেবার মত জিনিষও আমার দোকানে আছে। ভেতরে এসে দেখুন না।

বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিজয় সোৎসাহে তাঁহাকে উপহারের উপযোগী সৌখীন সামগ্রী দেখাইতে লাগিল।

বাহিরে ফুটপাথের উপর দিয়া হনুমান সিং বিড়ি টানিতে টানিতে অলসমন্থর পদে আসিতেছিল, সে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দোকানের ভিতর বিজয় বৃদ্ধকে বলিতেছে—

বিজয়ঃ যদি কাচের বাসন উপহার দিতে চান, তাও আছে। ও-ঘরে চলুন। চায়ের সেট্, ডিনার সেট্ –আরও নানারকম জিনিস আছে—

মধ্যবর্তী দরজা দিয়া বিজয় বৃদ্ধকে পাশের ঘরে লইয়া গেল; এ-ঘরে কার্তিক কাউণ্টারে বসিয়াছে। একটা দেয়াল ছাদ পর্যন্ত কেবল কাঁচের বাসনে ঠাসা। বৃদ্ধ সেগুলি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিলেন।

বিজয়ঃ কম দামের জিনিসও আছে আবার বেশী দামের জিনিসও আছে, আপনার যেমন ইচ্ছে—

এই সময় বিজয়ের মনোযোগ অন্য ঘরের দিকে আকৃষ্ট হইল; সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বাহিরের সরু দরজা দিয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে বলিল—

বিজয়ঃ আপনি ততক্ষণ দেখুন, আমি আসছি—

বৃদ্ধ গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলেন না, যেমন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিজয় হাস্যবিস্মিত মুখে লক্ষ্মীর কাছে গেল—

কিন্তু লক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই, চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি; বিজয়

কাছে আসিতেই সে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মী : বিজয়বাবু— !

বিজয় তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিল—

বিজয় : কী—কি হয়েছে লক্ষ্মী দেবী ?

ও-ঘরে লক্ষ্মীর আর্তস্বর বৃদ্ধের কানে যাইতেই তিনি তীরবিদ্ধবৎ ফিরিলেন। মাঝের দরজা দিয়া লক্ষ্মী ও বিজয়কে দেখা গেল ; বৃদ্ধ একবার চশমা তুলিয়া তাহাদের দেখিলেন, তারপর ত্বরিতে আবার চশমা নামাইয়া পিছু ফিরিয়া কাঁচের বাসন পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী বৃদ্ধকে দেখিতে পায় নাই, তাহার চক্ষু বিজয়ের মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল ; নিটোল সুন্দর চিবুকটি অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। অবশেষে সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল—

লক্ষ্মী : বিজয়বাবু, আমি—আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি—

বিজয় : সাবধান—?

লক্ষ্মী : আমি জানতে পেরেছি, কেউ আপনার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে

বিজয় : (মহাবিস্ময়ে) অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে ! কিন্তু কেন ? আমি তো কারুর অনিষ্ট করিনি—!

লক্ষ্মী : তা না করুন, তারা আপনার ক্ষতি করতে চায়—তারা আপনাকে—

বিজয় :—কিন্তু তারা কারা।

লক্ষ্মী ক্ষণেকের জন্য মাথা নীচু করিল।

লক্ষ্মী : ও কথা জানতে চাইবেন না। তারা চায় আপনি এ পাড়া থেকে দোকান তুলে চলে যান ; তারা আপনার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছে—

বিজয়ের মুখ গম্ভীর হইল। সে একবার বাহিরে মনোহর ভাণ্ডারের পানে তাকাইল, তারপর লক্ষ্মীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

বিজয়ঃ বুঝেছি। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি গুণ্ডার ভয়ে পালাব না।

লক্ষ্মীঃ পালাতে আমি বলি না। আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে দিলুম। আপনি সাবধানে থাকবেন। বলুন, সাবধানে থাকবেন?

ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মী বিজয়ের বাহুর উপর হাত রাখিল; বিজয় পরম সম্ভ্রমের সহিত বলিল—

বিজয়ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য সাবধান হব। আর—আর—আপনি দুঃখ করবেন না। দোষ কারুর নয়, দোষ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার; ধনতন্ত্রের আমলে পরের গলা না কাটলে নিজের উন্নতি হয় না—এটা সেই অর্থনৈতিক নিয়মের একটা সামান্য উদাহরণ, আর কিছু নয়।

বিজয়ের কণ্ঠস্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; লক্ষ্মীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে তাহা ঢাকা দিবার জন্য অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

লক্ষ্মীঃ আমি যাই—

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। বিজয় কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বিষণ্ণ মুখে বৃদ্ধের কাছে ফিরিয়া গেল; ক্লান্তস্বরে কহিল—

বিজয়ঃ মাফ করবেন, একটু আটকে পড়েছিলুম।—কিছু পছন্দ করলেন নাকি?

বৃদ্ধ তাহার দিকে ফিরিয়া চোখের চশমা তুলিলেন, পাশের ঘরের দিকে উঁকি মারিলেন, তারপর বলিলেন—

বৃদ্ধঃ তোমার মুখ শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? ও মেয়েটা কে?

বিজয় মুখ গম্ভীর করিল, লক্ষ্মী সম্বন্ধে এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তি তাহার ভাল লাগিল না।

বিজয়: উনি একজন মহিলা।—আপনার যদি কিছু—

বৃদ্ধ: পরে কিনব। ও মেয়েটা—মানে মহিলাটি কী বলে গেলেন তোমাকে? মুষড়ে পড়েছ যে!

বিজয় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল—

বিজয়: মুষড়ে পড়িনি, ছোটর ওপর বড়র অত্যাচার দেখে মনটা তেতো হয়ে গেছে।—ঐ যে মনোহর ভাণ্ডার দেখছেন ওঁরা আমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছেন।

বৃদ্ধ: তাই নাকি? তা সেই খবর বুঝি মেয়েটা—মহিলাটি দিয়ে গেলেন?

বিজয় ও প্রশ্নের জবাব দিল না, বলিল—

বিজয়: আমি এখানে দোকান করেছি ওঁদের সহ্য হচ্ছেনা; ওঁরা আমাকে তাড়াতে চান।

বৃদ্ধ: হুঁ—তুমি এখন কি করবে?

বিজয়: করবার কী আছে—কিছুই না। আমি পালাব না।

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

ডিজল্ভ্

রাত্রি হইয়াছে। কার্তিক ও বিজয় দোকান বন্ধ করিতেছে। কার্তিকের চক্ষু ঘুমে ঢুলুঢুলু।

আলো নিভাইয়া দু'জনে বাহিরে আসিল; বিজয় দরজায় তালা লাগাইল।

বিজয়: আচ্ছা।—কাল সকাল সকাল আসিস্।

নিদ্রালুভাবে স্যালুট করিয়া কার্তিক চলিয়া গেল।

বিজয় ফায়ার ব্রিগেডের স্তম্ভটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঊর্ধ্বে

চাহিয়া দেখিল লক্ষ্মীর জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিজয় একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পানে চলিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পরদিন প্রভাত। বেলা আন্দাজ ন'টা।

কাতিক দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল দোকান এখনও খোলে নাই। এমন প্রায় রোজই হয়, বিজয় পরে আসে। কার্তিক বদ্ধ দরজার সম্মুখে ধাপের উপর বসিল।

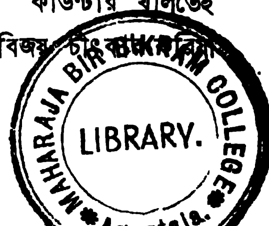
রাস্তা দিয়া নানা জাতীয় লোক যাতায়াত করিতেছে। মেসের একটি ঝি এক ঝুড়ি তরি-তরকারী লইয়া যাইতেছিল, তাহার ঝুড়ি হইতে একটি মূলা খসিয়া ফুটপাথে ঠিক কাতিকের সামনে পড়িল; ঝি লক্ষ্য করিল না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কাতিক টপ্‌ করিয়া মূলাটি তুলিয়া লইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রাতরাশ শুরু করিল।

ওদিকে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে। ধনেশের অফিস ঘরের জানালাও খুলিয়া গেল। নীলাম্বর জানালা দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার দুষ্ট চক্ষুটি নাচিয়া উঠিল।

বিজয় আসিয়া দেখিল, কাতিক মূলা শেষ করিয়াছে। সে তালা খুলিয়া দোকানে প্রবেশ করিল, কার্তিক তাহার পিছন পিছন গেল।

দোকানের ভিতর অন্ধকার। কার্তিক তাড়াতাড়ি গিয়া কাউণ্টার খুলিতে প্রবৃত্ত হইল, বিজয় পাশের ঘরে গেল। কাউণ্টার খুলিতেই একঝলক রৌদ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল; বিজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—

বিজয়: অ্যাঁ! কাতিক, একি!



দোকানের ভিতর দিয়া যেন একটা সর্বনাশা ঝড় বহিয়া গিয়াছে; ভাঙা-ছেঁড়া জিনিসপত্র বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে ছড়ানো, কাঁচের বাসন-গুলি সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মেঝেয় পড়িয়া আছে।

কার্তিক ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ের পাশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিজয়ের মুখ শীর্ণ ও সাদা হইয়া গিয়াছিল, পায়ের জোর যেন আর ছিল না; সে কার্তিকের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইল। প্রায় দেড় হাজার টাকার জিনিষ খোলামকুচি হইয়া মেঝেয় ছড়াইয়া আছে! আক্রমণ যে এই দিক দিয়া আসিবে, তাহা বিজয় কল্পনা করে নাই। তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল।

বিজয়: কার্তিক, সব গেছে রে! আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে ওরা!

এই বিপুল ধ্বংসের সম্মুখে কার্তিক কাঁদো-কাঁদো মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, বিজয়ের কথায় সচকিতে মুখ তুলিল।

কার্তিক: অ্যাঁ—! কে—কারা করেছে?

কাউণ্টার হইতে খট্ খট্ শব্দ আসিল, ভারী গলায় আওয়াজ হইল—

আওয়াজ: এ বাবু দোকানদার!

দু'জনে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইল। হনুমান সিং কাউণ্টারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপের হাসি। তাহাকে দেখিয়া বিজয়ের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; কাল বৈকালে এই দুষ্মনের মত লোকটাকে সে কয়েকবার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে। হয়তো এই গুণ্ডাটাই রাত্রে তালা খুলিয়া তাহার দোকানে ঢুকিয়া সমস্ত তচনচ করিয়াছে, আর আজ সকালে তাহার সর্বনাশ দেখিয়া

পরিহাস করিতে আসিয়াছে। বিজয় কাউণ্টারের কাছে গিয়া যথাসম্ভব সংযতকণ্ঠে বলিল—

বিজয় : কি চাও ?

হনুমান সিং দোকানের এদিক-ওদিক সকৌতুক নেত্রে দেখিয়া হে হে করিয়া হাসিল।

হনুমান : আরে, তুমহার দুকান তো বিলকুল পস্ত্ হৈয়ে গিয়েছে ! রাতকো বিল্লি ঘুষেছিল কি ?

বিজয়ের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে কাউণ্টারের উপর দুই হাত রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া অবরুদ্ধ ক্রোধের কণ্ঠে বলিল—

বিজয় : তুমি ঢুকেছিলে ! তুমি আমার দোকান তচনচ করেছ !

ইতিমধ্যে আমাদের পরিচিত বৃদ্ধটি কখন্ ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া এই বিতর্ক শুনিতেছিলেন। হনুমান সিং বিজয়ের কথায় যেন অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছে, এমনি ভাবে চক্ষু পাকাইয়া বলিল—

হনুমান : হামি ? আরে দুকানদার, ই তুম্ বড়া বুরা বাৎ বোলছে। হামি শরীফ আদমি আছে—ভদ্দরলোক। হামারা ঝুঠা বদনামি করেগা তো আচ্ছা নেহি হোগা।

গুণ্ডার ধমকে বিজয় ভয় পাইল না।

বিজয় : কী—তুমি আমার দোকান নষ্ট করবে, আবার আমাকেই চোখ রাঙাবে ?

ধমকে ফল হইল না দেখিয়া হনুমান সিংয়ের ভাবভঙ্গী বদলাইয়া গেল ; সে মুরুব্বি বন্ধুর মত সদয় কণ্ঠস্বর বাহির করিল—

হনুমান : আরে বাবু, শুনো হামারা বাৎ। তুম্ নৌযবান হ্যায়, নয়া দুকান কিয়া হায়, তুম্‌কো হুঁসিয়ারীসে চল্‌না চাহিয়ে। বড়াসে মোকাবিলা করনা তুম্‌হারা ফর্জ নহি হ্যায়—বোঝলেন হামারা বাৎ—তুম্‌হার

দুকান লোকসান হৈয়েছে, বড়ী আফসোসকি বাৎ আছে; মালুম হোচ্ছে কি ঈ মহল্লার হাওয়া তোমার লিয়ে আচ্ছা নহি আছে। সম্‌ঝা? কল্‌কাতা শহরমে কেৎনা যায়গা আছে তুমি ঔর কঁহি যাকে দুকান করো, কোই কুচ্ছু বোলবে না! সম্‌ঝা?

বিজয়: বুঝেছি। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! বাঙলা দেশের বুকের ওপর বসে তুমি বাঙালীকে চোখ রাঙাচ্ছ! কিন্তু তুমিও একটা কথা শুনে রাখো। তুমি গুণ্ডা হতে পার, কিন্তু তোমাকে আমি ভয় করি না। এ-পাড়া থেকে আমি এক-পা নড়ব না, তোমার যা ক্ষমতা থাকে তুমি কোরো।

হনুমান কিছুক্ষণ বিজয়ের আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি মনে-মনে একটু সম্ভ্রম অনুভব করিল। শেষে তাচ্ছিল্যভরে হাত উল্টাইয়া বলিল—

হনুমান: আপকা হিম্মৎ। লেকেন ই কাম আচ্ছা হৈল না।

হনুমান সিং হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। আমাদের বৃদ্ধটি ইতিমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বিজয় ক্লান্ত ম্রিয়মানভাবে গিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল, দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। লক্ষ্মী কখন নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে জানিতে পারে নাই, তাহার ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চক্ষু খুলিয়া চাহিল।

লক্ষ্মী: বিজয়বাবু—

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিবার চেষ্টা করিল; লক্ষ্মীর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। কেহই আর কাহারও পানে তাকাইতে পারিল না, মুখ নীচু করিয়া মেঝের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

শো-কেসটার কাঁচগুলো ফাটিয়া গিয়াছিল; তাহার পাশে মেঝের উপর ভেনাসের মূর্তিটা দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া ছিল। দুই হাজার

বছরের অবহেলা যে-ক্ষতি করিতে পারে না, ইএক রাত্রির বর্বরতা যেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। শহরের অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন অংশে আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ ফুটপাথের ধারে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন; হনুমান সিং দৈহিক শক্তির দর্পে বুক ফুলাইয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে সেই দিকে আসিতেছিল।

সে গাছের কাছাকাছি আসিতেই বৃদ্ধ এক-পা অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; হনুমান সিং ভূত দেখার মত চমকিয়া হাতের বিড়ি ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিতেই সে যেন একেবারে কেঁচো হইয়া গেল; আভূমি মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিয়া সম্ভ্রম-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল—

হনুমান: মালিক! সরকার!—

বৃদ্ধ ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিলেন; হনুমান তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করিল। বৃদ্ধ একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধ: আমার সঙ্গে এস—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বৃদ্ধ বৃক্ষতল ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন; হনুমান পোষা কুকুরের মত তাঁহার পিছু পিছু চলিল।

ডিজল্‌ভ।

অপরাহ্ণ। ধনেশের অফিস ঘর।

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর লইয়া ধনেশ বসিয়া আছেন; টেবিলের পাশে নীলাম্বর দাঁড়াইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তভাবে হাত ঘষিতেছেন। দুজনের চোখাচোখি হইল; নীলাম্বর অর্থপূর্ণভাবে চক্ষু নাচাইলেন।

ধনেশ: নীলাম্বর, চা খাও।

নীলাম্বর : না না, তুমি খাও। পেয়ালা তো একটাই দেখছি—

পেয়ালা একটাই বটে। ধনেশ ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া তাকাইলেন, তারপর টেলিফোন তুলিয়া লইলেন। প্রত্যহ বৈকালে উপর হইতে তাঁহার চা আসে ; একটি পেয়ালা ও তদনুযায়ী দুধ চিনি কেক প্রভৃতি। অন্য দিন তিনি একাই চা পান করেন ; কিন্তু আজ তিনি নীলাম্বরের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাকে প্রসাদ বিতরণ করা প্রয়োজন।

ধনেশ : দাঁড়াও পেয়ালা আনাচ্ছি ওপর থেকে—

তিনি টেলিফোনে একটা নম্বর দিলেন।

কাট্।

আজ লক্ষ্মী কলেজে যায় নাই ; অসুস্থ-মনে সে নিজের শয়নঘরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। টেলিফোনের ঘণ্টির শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে একটা লম্বা বারান্দা—তাহার দুই পাশে দুই সারি ঘর। এই বারান্দার একপ্রান্তে সিঁড়ি নীচে দোকানের দিকে গিয়াছে, অন্য প্রান্তে চাকর-বাকরের ব্যবহারের জন্য আর একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। বারান্দায় আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নাই, দু-তিনটা কাঠের কাবার্ড ও উঁচু টুলের উপর একটি টেলিফোন আছে।

লক্ষ্মী আসিয়া টেলিফোন ধরিল।

লক্ষ্মী : হ্যালো !—ও, বাবা……! চাকরবাকর কেউ বাড়ী নেই… তাদের এই মাত্র ছুটি দিয়েছি, তারা সার্কাস দেখতে গেছে…বাঃ, চাকর বলে কি তাদের আমোদ-আহ্লাদ নেই !……কী দরকার তোমার বল না…চায়ের পেয়ালা চাই আর একটা ? বেশ তো, আমি নিয়ে যাচ্ছি—

ফোন রাখিয়া লক্ষ্মী একটা কাবার্ডের দিকে গেল।

কাট্।

ফোন রাখিয়া ধনেশ অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিলেন; তারপর একখণ্ড কেক লইয়া তাহাতে কামড় দিলেন, নীলাম্বরকে বলিলেন—

ধনেশ: খাও। পেয়ালা আসছে!

নীলাম্বর কেকের দিকে হাত বাড়াইলেন!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। দোকানের কাজ চলিতেছে; খরিদ্দার আসিতেছে যাইতেছে। কাউণ্টারে কর্মব্যস্ততা।

পেয়ালা হাতে লক্ষ্মী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। আধাআধি নামিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সদর দরজা দিয়া হনুমান সিং প্রবেশ করিয়া সটান ধনেশের অফিস ঘরের দিকে যাইতেছে। লক্ষ্মী দোকানের পুরাতন ভৃত্য হনুমান সিংকে চিনিত এবং সে-ই যে বিজয়ের দোকান ভাঙিয়াছে, সে বিষয়েও তাহার মনে কোনও সংশয় ছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হনুমান সিং অফিস ঘরের দরজার কাছে গিয়া চাপরাশিটাকে হাত নাড়িয়া ইসারা করিতেই সে ত্রস্তভাবে সরিয়া গেল। হনুমান সিং তখন পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আরও কিছুক্ষণ স্পন্দিতবক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লক্ষ্মী দ্রুতপদে নীচে নামিতে লাগিল।

কাট্।

অফিস ঘরে হনুমান সিংয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে ধনেশ ও নীলাম্বরের কেক-ভক্ষণে বাধা পড়িয়াছিল, তাঁহারা অর্ধভুক্ত কেক হাতে লইয়া বিমূঢ়ভাবে হনুমানের পানে তাকাইয়া ছিলেন। হনুমান বেশ গরম হইয়া ধনেশকে বলিতেছিল—

হনুমান : সাব্, হামি দুকানের নৌকর আছে। মালিকের নিমক খাইয়াছে, লেকেন বে-ইন্সাফ কাম কভি নহি করেগা—

লক্ষ্মী ইতিমধ্যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একবার ক্ষিপ্রচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা; তারপর মাথা হেঁট করিয়া ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

হনুমান :—হামি পহলমান আছে, লেকেন লুচ্চা-লফসা নহি—

ধনেশ অসহায়ভাবে নীলাম্বরের পানে চাহিলেন।

নীলাম্বর : আহাহা, হঠাৎ তোমার হল কি হনুমান! কাল একরকম ছিলে আজ আবার একরকম—!

আরও উত্তেজিত হইয়া হনুমান নীলাম্বরের দিকে তর্জনী নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—

হনুমান : এহি বাবুঠো পাক্কা হারামি আছে। সাব্, আপকোভি এহি বদমাসটা বুরা রাস্তামে লিয়ে যাচ্ছে। আপ সিধা-সাধা আদমি, এই শয়তানের ফান্দায় পড়ে বরবাদ হৈয়ে যাবেন। হামারা বাৎ শুনেন, ইসকো লাৎ মারিয়ে নিকাল-বাহার করিয়ে দেন।

নীলাম্বর থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধনেশ এই গুণ্ডার স্পর্ধা দেখিয়া মনে-মনে খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শাঁখের করাত যেমন যাইতে কাটে তেমনি আসিতেও কাটে; গুণ্ডার ধর্মহীন দুঃসাহস যাহারা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে, তাহারা নিজেরাও ঐ দুঃসাহসিকতার ভয়ে সর্বদা কাঁটা হইয়া থাকে। ধনেশ বাহিরে নিজের মর্যাদা যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

ধনেশ : কী বলতে চাও তুমি?

বাহিরে লক্ষ্মী আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে; তাহার মুখের অবসাদগ্রস্ত ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

হনুমান: সাব, হম সাফ সাফ বাৎ বোলবে! হামি দুকানের সিপাহী আছে, অগর কোই বদমাশ দুকানে হুজ্জৎ করনা চাহে, হম উস্কো নরেটি দাবকে নিকাল দিবে—লেকেন বে-গুনাহ আদমির উপর জুলুম করনা হমারা কাম নহি। লছ্‌মি ভাণ্ডারকা বাবু সাচ্চা আদমি আছে, ইমানদার আদমি আছে—উসকো হম কাহে মারেগা! ইস্‌ মহল্লেমে দুকান করনা কিসিকা মানা হ্যায়?

নীলাম্বর: আহা, চেঁচাচ্ছ কেন হনুমান—আস্তে!

হনুমান: (উদ্ধতস্বরে) নহি আস্তে বোলেগা! তুম খুন করনা চাহেগা ঔর হম চুপ রহেগা? কভি নহি।

নীলাম্বর: ওরে হনুমান, তোর গুষ্টীর পায়ে পড়ি আস্তে বল্—বাইরে কে শুনতে পাবে!

বাহিরে লক্ষ্মী শুনিতেছিল; তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

হনুমান: (ধনেশকে বাবুজী, হম বেইমানী নহি করেগা, লেকেন আপ য়ে সব ধন্ধা ছোড় দিজিয়ে। (নীলাম্বরকে) ঔর তুমকা ভি সাতা দেতা হ্যায়, লছমী ভাণ্ডারকা বাবুকো কুছভি খৎরা পৌঁছেগা তো—হাম তুমহারা কচুম্বা নিকাল দেগা। নমস্তে।

ধনেশকে সেলাম করিয়া হনুমান বাহির হইয়া গেল। তৎপূর্বেই লক্ষ্মী দ্রুত-চঞ্চল পদে দ্বার হইতে সরিয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে।

ঘরের মধ্যে নীলাম্বর ও ধনেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, তারপর নীলাম্বর সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিলেন—

নীলাম্বর: কেউটে সাপের ড্যাপ্! হনুমানকে টাকা খাইয়ে বশ করেছে। আচ্ছা—আমিও যদি কায়েতের বাচ্ছা হই—

ধনেশের মুখে কালোপযোগী কোনও গরম কথা যোগাইল না, তিনি

দুই মুষ্টি তুলিয়া টেবিলের উপর প্রচণ্ড জোড়া-কিল মারিলেন। চায়ের ট্রে সত্রাসে নাচিয়া উঠিল।

ডিজল্‌ভ।

পরদিন প্রভাত।

লক্ষ্মীর শয়নঘরে শয্যার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর প্রাতরাশের সরঞ্জাম সাজানো রহিয়াছে। লক্ষ্মী শয্যায় নাই, পাশেই স্নানের ঘরে গিয়াছে। আহ্লাদী একটি ময়ূরপাখার ঝাঁটা দিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। ঝাঁট দিবার মত জঞ্জাল কোনও দিনই ঘরে জমা হয় না, তবু লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙানোর মত এটা আহ্লাদীর দৈনন্দিন কার্য।

স্নান ঘরের বন্ধ দরজার ভিতর দিয়া লক্ষ্মীর গান শোনা যাইতেছে। পল্লীগীতির সুর, ভাষা ও ভাব তথৈবচ। মনের কথা যখন সরল পথে অভিব্যক্তি পায় না, তখন এমনি বিচিত্র প্রচ্ছন্ন পথে চলে।

লক্ষ্মী: গায়ে তোর দাগ লেগেছে রাইলো।
সোনার গায়ে শ্যাম কাজলের
দাগ লেগেছে রাইলো।

ক্যামেরা লুব্ধভাবে স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লক্ষ্মী স্নানের টবে আকণ্ঠ ডুবাইয়া বসিয়া স্নান করিতেছে; টবের সাবান গোলা জল দুধের মত শুভ্র ও ফেনিল! মনের আনন্দে জলকেলি করিতে করিতে সে গাহিতেছে—

লক্ষ্মী: জল আনিতে যমুনায় গেলি,
গাগরি রৈল পড়ে, নয়ন ভরে
শ্যামের কালো রূপ নিয়ে এলি!

মনে অনুরাগ জেগেছে রাইলো—
ভোমরা ছোঁয়া হেম কমলে
দাগ লেগেছে রাইলো।

জলের ভিতর হইতে একটি মৃণালবাহু তুলিয়া লক্ষ্মী কলের কক্ ঘুরাইয়া দিল, অমনি তাহার উপর জলের বৃষ্টিধারা নামিয়া তাহার মাথার উপর পড়িতে লাগিল।

শয়নকক্ষে সম্মার্জনীর কাজ শেষ করিয়া আহ্লাদী দেখিল লক্ষ্মীর স্নান ও গান তখনও শেষ হয় নাই। সে স্নান ঘরের দ্বারে গিয়া টোকা মারিল।

আহ্লাদী : ওলো, হ'ল তোর? চা যে জুড়িয়ে গেল—আর কত নাইবি!

ভিতর হইতে লক্ষ্মীর গলা আসিল—

লক্ষ্মী : এই যে হল দিদি—

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল—সদ্যফোটা শিশিরস্নাত একটী ফুলের মত। সে শয্যায় পাশে বসিয়া আহারে মন দিল। আহ্লাদী অসন্তোষপূর্ণ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

আহ্লাদী : এতক্ষণে মেয়ের নাওয়া হল। ক'টা বেজেছে তার হিসেব আছে। ইস্কুল যাবি কখন শুনি?

লক্ষ্মী পরম তৃপ্তির সহিত নতুন গুড়ের মুড়ির চাকতি চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

লক্ষ্মী : আজ কলেজে যাব না দিদি। আর তো দুদিন কলেজ খোলা আছে, তারপরই পূজোর ছুটি।

আহ্লাদী গালে হাত দিয়া তাকাইয়া রহিল।

আহ্লাদী : ইস্কুলে যাবি না। দিন দিন তুই হচ্ছিস কি লক্ষ্মী? দাদু কাশী গিয়ে অবধি তোর বড় আস্কারা বেড়েছে—না?

লক্ষ্মী : হুঁ, ঠিক তোর মতন। কাশী থেকে চিঠি এসেছে দাদু তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, বোধ হয় পুজোর পর এখানে আসবেন।

আহ্লাদী : আসুন না তিনি, সব বলে দেব তাঁকে। বলব নিজের নাৎনী নিজে সামলাও, পারব না আমি সামলাতে।

লক্ষ্মী : (হাসিয়া) তা বলে দিস্; লাগানো ভাঙানো তোর অভ্যেস সে কি আমি জানি না?—এখন ছাখ দেখি জান্‌লা দিয়ে আমার দোকান খুলেছে কিনা।

বুড়ী 'আমার দোকান' অর্থে মনোহর ভাণ্ডার বুঝিল।

আহ্লাদী : দোকান খুলেছে কি না জানলা দিয়ে দেখব কি করে লা? আমার কি চিংড়ি মাছের চোখ?

লক্ষ্মী : মরণ বুড়ীর। সামনে ছোট দোকান দেখতে পাচ্ছিস না —লক্ষ্মী ভাণ্ডার?

আহ্লাদী : (জানলা দিয়া দেখিয়া) ওমা ঐ দোকান! তা ও তো অন্য লোকের দোকান, তোর দোকান হতে গেল কোন দুঃখে?

লক্ষ্মী : পারি না তোকে নিয়ে দিদি। পোড়া চক্ষে দেখতে পাচ্ছিস না, বড় বড় অক্ষরে কী লেখা রয়েছে? লক্ষ্মী ভাণ্ডার—মানে আমার ভাণ্ডার। বুঝলি?

আহ্লাদী : অ মা! লক্ষ্মী ভাণ্ডার নাম হলেই তোর দোকান হল? কত রঙ্গই জানিস।

লক্ষ্মী : বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা, পরে বুঝবি। এখন ছাখ খুলেছে কি না।

আহ্লাদী : এই খুলল।

লক্ষ্মী আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আলস্য ভাঙিল।

লক্ষ্মী : আমাকেও তাহলে উঠতে হল। একবার দোকানে যেতে হবে।

আহ্লাদী : ও দোকানে তোর কি দরকার ?

লক্ষ্মী : দরকার ? আমার যে চকোলেট ফুরিয়ে গেছে দিদি।

লক্ষ্মী ফিক্ করিয়া হাসিল, ভিজা চুলগুলি বুকের দিকে টানিয়া আনিয়া ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া বসিল।

কাট।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দু'নম্বর কাউণ্টারে কার্তিক বেসাতি করিতেছে, অন্য কাউণ্টার সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। দোকানের ভিতরে বিজয় নিজের টেবিলে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে গরুড় পক্ষীর মত যোড়হস্তে হনুমান সিং দণ্ডায়মান। হনুমানের আর সে বিক্রম নাই, গোঁফ ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; মুখের ভাব দেখিলে বোধ করি কণ্ঠীধারী বৈষ্ণবেরও হিংসা হয়।

হনুমান : বাবুজি, হামাকে ছমা কোরেন—হামি কসুর করিয়েছে।

বিজয় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিজয় : কী—কি বলছ ?

হনুমান : হামি না বুঝিয়ে কসুর করিয়েছে—ঔর কভি অ্যাসা কাম নহি করে গা। বাবুজী, আপনে বেফিকির থাকেন, ঔর আপনার উপর কোই জুলুম হোবে না। হাম খুদ আপনার দুকান পাহারা দিবে।

বিজয় : (বিভ্রান্তভাবে) কিন্তু—কিন্তু—তুমি হঠাৎ—

হনুমান কোমর হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া হাত বাড়াইয়া বিজয়ের সম্মুখে রাখিল।

হনুমান : জি পানশো রূপী হামার কসুরের জুরমানা লিয়ে হামাকে ছমা কোরেন—

বিজয় : (চমকিয়া) কি—টাকা ! না না তোমার টাকা আমি

নেব না। আমার যা ক্ষতি করবার তা করেছ, এখন গরু মেরে জুতো দান করতে চাও! ও হবে না, নিয়ে যাও তোমার টাকা। কার সর্বনাশ করা টাকা তা কে জানে!

হনুমান একটু একটু করিয়া পিছু হটিতে লাগিল।

হনুমান: হুজুর আমার বাপের কসম, ওস্তাদের কসম, ই টাকা ধরমকা টাকা আছে। আপনে মেহেরবানি করকে ই টাকা লিয়ে হামাকে ছুটকারা দেন, নেহি তো হামার বড়া মুস্কিল হোবে। আদাব বাবুজি, আদাব—

আর বেশী তর্কবিতর্কের অবকাশ না দিয়া হনুমান সিং আদাব করিতে করিতে ও পিছু হটিতে হটিতে অন্তর্ধান করিল। বিজয় কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল তারপর নোটগুলি তুলিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া শেষে দেরাজে রাখিয়া দিল। তাহার মুখে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। গুণ্ডার মনেও ধর্মজ্ঞান জাগিয়াছে। যাক্ ভবিষ্যতে হয়তো আর কোনও গণ্ডগোল হইবে না, কিন্তু পাঁচশো টাকায় তাহার কতটুকু ক্ষতিপূরণ হইবে? যেসব মাল নষ্ট হইয়াছিল তাহা সমস্ত তাহার নিজের নয়, কতক বাজার হইতে ধারে আনিয়াছিল — বিক্রয় করিয়া মূল্য দিবে এই সর্তে। সেসব টাকা শোধ না করিলে বাজারে আর ধারে মাল পাওয়া যাইবে না। এদিকে পূজা আসিয়া পড়িল, মালের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার যোগান দিবার ক্ষমতা নাই। টাকা চাই অন্তত আরও দু'হাজার। কিন্তু কোথায় পাইবে সে টাকা? কে দিবে?

বিজয় দুই হাতে মাথা চাপিয়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

বাহিরে লক্ষ্মী কার্তিকের কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্তিক আকর্ণ হাসিয়া তাহাকে স্যালুট করিল এবং ফরমাস করিবার

পূর্বেই 'এক তক্তা চকোলেট বাড়াইয়া ধরিল। হাসিমুখে চকোলেট লইয়া লক্ষ্মী বলিল—

লক্ষ্মী : চিকা চিকা বুম। বিজয়বাবু কৈ?

কার্তিক একবার ভিতর দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—

কার্তিক : ভেতরে আছেন; টেবিলে বসে ভাবছেন।

বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বিজয়ের ভাবনার ভঙ্গীটা দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী ভিতরে গিয়া দেখিল, বিজয় সত্যই চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে; এমন কি লক্ষ্মী গিয়া যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল তখনও সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ গূঢ় কৌতুকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী : ভারি ভাবনায় পড়েছেন দেখছি! কিসের এত ভাবনা? মেয়ের বিয়ের?

বিজয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার চিন্তাচ্ছন্ন বিষণ্ন মুখ মুহূর্তে প্রফুল্ল হাসিতে ভরিয়া উঠিল। এই মেয়েটির মধ্যে জানি না কি আছে, তাহার কণ্ঠস্বর—এমন কি কেবলমাত্র তাহার আবির্ভাব—বিজয়ের মনকে অতিবড় দুঃসময়েও সতেজ প্রফুল্ল করিয়া তোলে, বর্ষণ-শঙ্কিত মেঘলা আকাশে অকস্মাৎ আলোর হাসি ঝিলমিল করিয়া ওঠে।

বিজয় তাড়াতাড়ি নিজের টুলটী লক্ষ্মীকে দিয়া নিজে একটি প্যাকিং বাক্স টানিয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—

বিজয় : তা ছাড়া আর কি! বাঙ্গালীর জীবনে কন্যাদায় ছাড়া আর কি কোনও দুর্ভাবনা আছে?

লক্ষ্মী মুখখানি উদ্বিগ্ন করিয়া বলিল—

লক্ষ্মী : তা, মেয়ে কি একেবারে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়েছে ?

বিজয়ও ছদ্ম বিষন্নতার সহিত বলিল—

বিজয় : তা অরক্ষণীয়া বৈকি। গরীব বাপ—মেয়ের বিয়ের টাকা কোথায় পাবে বলুন।

লক্ষ্মী : (নিশ্বাস ফেলিয়া) আহা—! তাই বুঝি মেয়ের ভাল পাত্র পাচ্ছেন না ?

বিজয় : হুঁ। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

লক্ষ্মী : আমি !

বিজয় : হ্যাঁ। আপনি যদি আপনার ছেলের বিয়ে দেন আমার মেয়ের সঙ্গে তবেই মেয়েটি সুপাত্রে পড়ে, নৈলে হাত-পা বেঁধে মেয়ে জলে ফেলে দিতে হবে—

গম্ভীর হইতে গিয়া লক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল।

বিজয় : না না, হেসে ওড়ালে চলবে না। বরপণ আমি দিতে পারব না বটে, কিন্তু আমার মেয়েটি কুলে শীলে সব দিক দিয়েই ভাল। ফুলের বন্দিঘাটি আমরা। আর আপনারা ?

লক্ষ্মী : দাদুর মুখে শুনেছি আমরা ফুলের মুখুটি।

বিজয় : ব্যাস ! তবে তো পালটি ঘরও হয়েছে—আর ভাবনা কি ?

লক্ষ্মী একবার বিজয়ের দিকে তাকাইয়া চক্ষু নত করিল; তাহার গালে একটু রক্তিমাভা দেখা দিল। সে চকোলেটের রূপালী তবক ছাড়াইয়া তাহাতে একটু কামড় দিল।

লক্ষ্মী : না, আর ভাবনা নেই !

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে বিজয়ের কান দুটা সহসা লাল হইয়া ঝাঁঝাঁ করিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল কাল্পনিক ছেলেমেয়ের বিবাহের ছুতা করিয়া সে যেন নিজেদেরই ঘটকালি করিতেছে।

প্রসঙ্গটাকে কোনও মতে চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

বিজয়: আর শুনেছেন, একটা সুখবর আছে। সেই যে গুণ্ডাটা দোকান নষ্ট করেছিল, সে আজ এসে পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেল।

লক্ষ্মীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী: ওমা, গুণ্ডার এত সুবুদ্ধি? তবে আর আপনি মাথায় হাত দিয়ে এত কী ভাবছিলেন?

বিজয় ম্লান হাসিয়া মাথা নাড়িল!

বিজয়: পাঁচশো টাকায় কী হবে, লক্ষ্মী দেবী, সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য। চীনে মাটির আর কাঁচের বাসন যা নষ্ট হয়েছে তারই দাম হবে হাজার দেড়েক। তাছাড়া চেয়ে দেখুন, (চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দোকান প্রায় খালি। নতুন করে মাল কেনবার পয়সা নেই, আর বাজারে ধারও পাবনা।

লক্ষ্মী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ধ্বংসের চিহ্নগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধ্বংসজনিত শূন্যতার পরিপূরণ হয় নাই। বিজয় একটু ফিকা হাসিল।

বিজয়: কোথায় ভেবেছিলুম পূজোর সময় লাভ করব। দোকানকে নিজের পায়ে দাঁড় করাব—তা—

লক্ষ্মী: কত টাকা আপনার দরকার?

বিজয় চকিয়া মুখ তুলিল, লক্ষ্মীর পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

বিজয়: না লক্ষ্মী দেবী, তা হয় না। আপনার অনেক অনুগ্রহ আমি নিয়েছি—কিন্তু টাকা নিতে পারব না। যদি শোধ করতে না পারি!

লক্ষ্মী : আমার কথার উত্তর দিন না। কত টাকা পেলে আপনি দোকান আবার আগের মত করতে পারেন?

বিজয় : (ইতস্তত করিয়া) তা—হাজার দুই তো বটেই। প্রথমে বাজার-দেনা শোধ করতে হবে—। কিন্তু ওকথা যাক। আপনার শাড়ির পাড়টি তো ভারি চমৎকার—।

লক্ষ্মী : পাড়ের কথা পরে শুনব। এখন আমার কথা শুনুন। আপনি ভাববেন না যে আমি আপনাকে দান-খয়রাৎ করতে চাই। আমি যদি আপনাকে টাকা দিই তাহলে নিজের স্বার্থেই দেব—

বিজয় :—কিন্তু—

লক্ষ্মী : আবার কিন্তু। আপনি আগে টেবিলের সামনে ভাল ক'রে বসুন তো দেখি—

বিজয় প্যাকিং কেস্ সরাইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল, ; লক্ষ্মী নিজের টুল টানিয়া তাহার সহিত মুখোমুখি হইয়া বসিল।

লক্ষ্মী : (একটু হাসিয়া) হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। এখন আমার প্রস্তাব শুনুন, নিতান্তই ব্যবসা-ঘটিত প্রস্তাব—দয়া মায়া বা অনুগ্রহ নয়।

বিজয় : (ক্ষীণকণ্ঠে) বলুন—

লক্ষ্মী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মী : দেখুন, আপনার দু'হাজার টাকা দরকার, না পেলে এমন জিনিসটি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যদি পারি তাকে বাঁচাতে, আমার উচিত নয় কি বাঁচানো? আমার হাতে অবশ্য দু'হাজার টাকা নেই—কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো যোগাড় করতে পারি—

বিজয় : কিন্তু—

লক্ষ্মী : আমার কথাটা শেষ করতে দিন। শুনুন—

অধীরভাবে বিজয়ের মুখ বন্ধ করিয়া লক্ষ্মী আবার বলিতে আরম্ভ করিল। বিজয় নীরবে শুনিতে লাগিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

আধ ঘণ্টা পরে। লক্ষ্মী দুই কেতা দলিলের মত কাগজ হাতে লইয়া পড়িতেছে। পড়া শেষ হইলে সে সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িল, কাগজে দস্তখৎ করিয়া বিজয়ের দিকে আগাইয়া দিল। বিজয়ও দুইটি কাগজে সহি করিয়া একটি লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া দিল, অপরটি ভাঁজ করিয়া নিজের পকেটে রাখিল। লক্ষ্মী নিজের দলিলটি সযত্নে ব্লাউজের মধ্যে লুকাইল। দু'জনে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া হাসিল; হাত দুটি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর দিয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বিজয়ের হাতদুটিও সমধিক আগ্রহে টেবিলের মাঝখান পর্যন্ত গিয়া তাহাদের গ্রহণ করিল। গোপনে গোপনে এই দুইটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এই নীরব করাশ্লেষ যেন তার উপর নিবিড় আন্তরিকতার শিলমোহর মুদ্রিত করিয়া দিল।

ফেড্‌ আউট।

ফেড্‌ ইন্‌।

ধনেশের অফিস ঘর। সকালবেলা ধনেশ এবং নীলাম্বর টেবিলের দুই পাশে বসিয়া সদ্য-আগত ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছেন। চিঠির অধিকাংশই ব্যবসায়ীদের টাকার তাগাদা; পড়িতে পড়িতে ধনেশের মুখ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অপ্রসন্ন মন্তব্য করিতে করিতে চিঠিগুলি একে একে চোথা কাগজের বাস্কেটে ফেলিতেছেন।

ধনেশ: (একটি চিঠি খুলিয়া) হুঁ:—স্টিফেন অ্যাণ্ড কো—মাত্র ১২০০৲ টাকা পাওনা হয়েছে তাই তাগাদার ওপর তাগাদা—(বাস্কেটে

ফেলিলেন) একটা চিঠি লিখে দাও, নীলাম্বর; এমন অভদ্রভাবে তাগাদা করলে ওদের মাল আমরা নেব না—

নীলাম্বর শান্তভাবে নিজের চিঠিপত্র দেখিতে দেখিতে চোখ না তুলিয়াই বলিলেন—

নীলাম্বর : আজই লিখে দি'চ্ছ।

ধনেশ : (অন্য চিঠি খুলিয়া) এন বোস—পারফিউমার। এঁরও টাকা চাই—৬৭০০৲ টাকা। দেব না টাকা—কাউকে পূজোর আগে টাকা দেব না। কেন, আমি কি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি!

নীলাম্বর : ছোটলোক—ছোটলোক—

ধনেশ : (তৃতীয় চিঠি খুলিয়া) এই আবার এক ফ্যাচাং বাবা জুটিয়ে গেছেন—ফায়ার ইন্সিওর। তিন মাস অন্তর এঁদের টেক্সো গুঁজতে হবে! বাবার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না, দোকান ফায়ার ইন্সিওর করেছেন। যত সব—! নীলাম্বর, ইন্সিওরেন্সের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দাও, মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার দরকার নেই। ছ'লাখ টাকায় দোকান ইন্সিওর—ননসেন্স।

ধনেশ চিঠিখানা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

নীলাম্বর : না না, ছিঁড়ো না। ইন্সিওর একটা থাকা দরকার—

ধনেশ থামিয়া গেলেন।

ধনেশ : থাকা দরকার! কী দরকার?

নীলাম্বর : কিছু বলা তো যায় না, চারিদিকে শত্রু। মনে কর দোকানে যদি আগুন লেগেই যায়। ওটা থাকা ভাল।

নীলাম্বর চক্ষু নাচাইলেন। ধনেশ দ্বিধাভরে চিঠিখানা পাশে রাখিয়া দিলেন; কথাটা যদিও তাঁহার মনের মত হইল না, তবু নীলাম্বরের বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করার সাহস তাঁহার নাই।

ধনেশ : তুমি বলছ—থাক। কিন্তু—

এই সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল ; ধনেশ বিরক্ত ভাবে তাহা তুলিয়া লইলেন।

ধনেশ : হ্যালো……কে, লক্ষ্মী ?

উপরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া লক্ষ্মী পিতাকে টেলিফোন করিতেছে, তাহার মুখে একটু আদুরে আদুরে ভাব।

লক্ষ্মী : হ্যাঁ বাবা, আমি—তুমি বুঝি এখন খুব ব্যস্ত আছো ?

ধনেশ অভ্রভেদী গাম্ভীর্যের সহিত ফোনের মধ্যে বলিলেন—

ধনেশ : ব্যস্ত নেই তো কি খেলা করছি ? কি দরকার তোমার ?

লক্ষ্মী : না—কিছু নয়। খুব ব্যস্ত আছ বলেই বোধ হয় কথাটা ভুলে গেছ—

ধনেশ : ভুলে গেছি ! কী ভুলে গেছি ?

লক্ষ্মী : এই—পূজো এসে পড়েছে তা বোধ হয় তোমার মনে নেই।

ধনেশ একটু গ্রাম্ভারি হাস্য করিলেন।

ধনেশ : পাগলি কোথাকার ! পূজো এসেছে যদি মনেই না থাকবে, তবে এতবড় কারবার চালাচ্ছি কি করে ?

লক্ষ্মী : (উৎসুক ভাবে) মনে আছে ! আমার উপহারের কথাটা ভোলনি তাহলে ?

ধনেশ : (ভ্রূকুটি করিয়া) উপহার ! কিসের উপহার !

লক্ষ্মী : বা—তুমি জান না ! দাদু যে ফি বছর পূজোর সময় আমাকে উপহার দেন—

ধনেশ : ও হো—! তা তোমার যা দরকার তুমি দোকান থেকে নিয়ে যাও। তোমাকে মানা করে কে ?

লক্ষ্মী : কিন্তু দাদু আমাকে চেক দিতেন ; আমি আমার পছন্দমত কাপড় গয়না কিনতুম—

ধনেশ : চেক্—এঁ—তাই নাকি? তা—বেশ। কত টাকার চেক দিতেন বাবা?

লক্ষ্মী : (মধুর কণ্ঠে) দাদু দু'হাজার টাকার চেক্ দিতেন!

ধনেশ : অ্যাঁ! কত- দু'হাজার টাকা!

লক্ষ্মী : হ্যাঁ বাবা। দাদু বলতেন, ওর কমে তাঁর নাতনীর মর্য্যাদা থাকে না—

ধনেশ : কিন্তু—দু'হাজার! নীলাম্বর!

নীলাম্বর কেবল দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িলেন।

লক্ষ্মী : কেন, দু'হাজার কি তোমার বড্ড বেশী মনে হচ্ছে বাবা? দাদু কিন্তু—

ধনেশ : (বিরক্ত ভাবে) বাবা তোমাকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে হয়ে করে দিয়েছেন! আমি—আমি—৫০০৲ টাকার বেশী দেব না।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর উদাসকণ্ঠে বলিল—

লক্ষ্মী : তার দরকার কি! তোমার যদি দিতে কষ্ট হয় তাহলে কিছুই দিও না বাবা! দাদু কিন্তু শুনলে দুঃখ করবেন—হয়তো মনে করবেন, দোকান ভাল চলছে না—

ধনেশের এবার আঁতে ঘা লাগিল; উপরন্তু পিতার কানে কথাটা উঠিলে তিনি কি ভাবে উহা গ্রহণ করিবেন, তাহাও বলা শক্ত। ধনেশ আস্ফালন করিয়া উঠিলেন—

ধনেশ : কে বলে দু'হাজার টাকা দিতে আমার কষ্ট হবে। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক্ কাটতে পারি। নীলাম্বর, আমার চেক্ বুক।

নীলাম্বর মুখ একটু বিকৃত করিয়া চেক্-বুক বাড়াইয়া দিলেন। ধনেশ গরগর করিতে করিতে চেক্ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডিজল্ভ্।

নিজের ঘরে, দু'হাতে চেক্‌টি উঁচু করিয়া ধরিয়া লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বিজয়িনীর হাসি।

ডিজল্‌ভ।

বিজয়ের দুই কুঠুরীর দোকান তিন কুঠুরিতে প্রসারিত হইয়াছে—মাথার উপর 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' সাইনবোর্ডও তদনুযায়ী লম্বা হইয়াছে! এখন পাশাপাশি তিনটি কাউণ্টার। নূতন কাউণ্টারে কার্তিকের দলের একটি ছেলে বসিয়াছে।

দোকানের সম্মুখে হনুমান সিং গোঁফে চাড়া দিতে দিতে মুরুব্বির মত পায়চারি করিতেছে, যেন দোকানের তত্ত্বাবধানের ভার তাহারই উপর!

লক্কা পায়রার মত চেহারা একটি যুবক কার্তিকের কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবক : এক প্যাকেট কাঁচি।

বিজয় এই সময় ঐ ঘরে কি একটা জিনিস লইতে আসিয়াছিল, যুবককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয় : আরে প্রমোদ—তুমি?

প্রমোদ চশমার ভিতর দিয়া বিজয়কে ঈষৎ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল—

প্রমোদ : কে—বিজয় না? তুমি এখানে কি করছ হে?

বিজয় সহাস্যে কাউণ্টারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় : এটা আমারই দোকান ভাই।

কাতিক এই সময় এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কাউণ্টারের উপর ফেলিল।

কার্তিক : এক প্যাকেট কাঁচি—দশ পয়সা।

প্রমোদ প্যাকেট তুলিয়া লইয়া খুলিতে খুলিতে বিজয়ের দিকে চক্ষু বাঁকাইয়া চাহিল!

প্রমোদ: তোমার দোকান—বল কি? বি-এ পাশ করে শেষে মুদিখানার কাজ আরম্ভ করলে—অ্যাঁ!

মুখ বাঁকাইয়া প্রমোদ একটা সিগারেট ধরাইল। বিজয়ের মুখের হাসি মলিন হইয়া গেল।

বিজয়: তা কি করব ভাই, যার যেমন ক্ষমতা। তুমি এখন কি করছ বল।

প্রমোদ: পোষ্ট গ্রাজুয়েটে জয়েন করেছি। কিন্তু তুমি শেষে দোকান খুললে হে! চাকরি-বাকরি পেলে না বুঝি? হা—হা—মনিহারীর দোকান! মাখন নিখিল শুনলে খুব হাসবে -হা হা! আচ্ছা চললুম।

কার্তিক: সিগারেটের দাম—দশ পয়সা।

প্রমোদ বিরক্তভাবে ফিরিল।

প্রমোদ: দাম আবার কিসের? তোমার দোকানে আবার দাম কিহে বিজয়? একসঙ্গে বি-এ পর্যন্ত পড়েছ, আবার দাম! আচ্ছা আর একদিন আসতে চেষ্টা করব—

ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে প্রমোদ চলিয়া গেল। কার্তিক লাফাইয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—

কার্তিক: দাম না দিয়ে চলে গেল স্যার। ধরি গিয়ে রাস্তায়?

বিজয়: ধরে কি করবি?

কার্তিক: গলায় গামছা দিয়ে দাম আদায় করব স্যার। রাস্তায় হনুমান সিং আছে—ও যাবে কোথায়?

বিজয় ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

বিজয়: না, এবারটা যেতে দে।

বিজয় যাহা লইতে আসিয়াছিল তাহা লইয়া চলিয়া গেল। ব্যর্থ আক্রোশে কার্তিক প্রমোদের উদ্দেশ্যে একবার মুখ ভ্যাংচাইল।—

রাস্তা দিয়া একটি মেয়ে-কলেজের লম্বা গাড়ি আসিতেছিল; লক্ষ্মী ভাণ্ডারের কাছে আসিয়া গাড়ি থামিল। হনুমান সিং তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ির পিছনের দ্বার খুলিয়া দিল। ছয় সাতটি কলেজের মেয়ে কলহাস্য করিতে করিতে গাড়ি হইতে নামিল—লক্ষ্মীও সঙ্গে আছে। ইহারা সকলেই লক্ষ্মীর সহপাঠিনী ও সখী। লক্ষ্মী তাহাদের পূজার বাজার করিবার জন্য লক্ষ্মী ভাণ্ডারে ধরিয়া আনিয়াছে।

লক্ষ্মী অগ্রবর্তিনী হইয়া সকলকে দোকানের মধ্যে লইয়া গেল। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতেই বিজয় তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিল।

লক্ষ্মী : বিজয়বাবু, এই নিন, আপনার কয়েকটি ক্রেতা এনেছি—

বিজয় সসম্ভ্রমে দুই করতল যুক্ত করিল।

বিজয় : আসুন—আসুন—

লক্ষ্মীর নিকটতমা সখী অজিতা তাহার প্রতি একটি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিল; লক্ষ্মীর কথাগুলি যে দ্ব্যর্থ-বাচক হইয়াছে তাহা সে নিজে লক্ষ্য করে নাই।

অতঃপর মেয়েরা দোকানের ঘরে ঘরে পণ্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল! বিজয় অত্যন্ত নিপুণভাবে নানা সৌখীন দ্রব্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলকে লুব্ধ করিয়া তুলিল। তাহার মিষ্ট কথা ও মিষ্ট চেহারার অনিবার্য আকর্ষণে মেয়েরা তাহার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল।

ওঘরে কার্তিক একটি মেয়েকে কাঁচের বাসন দেখাইতেছে; একটি কাঁচের সুন্দর ফুলদানী হাতে লইয়া তাহার গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে—

কার্তিক : এই দেখুন মিস্, কাঁচের ফুলদানী—ফুলদানী তো নয়,

যেন নিজেই একটি পদ্মফুল। আর কী মজ্‌বুৎ। যেন লোহার তৈরী। আছাড় মারলে ভাঙবে না। দেখবেন? এই দেখুন—চিকা চিকা বুম—

কার্তিক ফুলদানীটি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ লুফিয়া লইল; ফেলার কৌশলে ফুলদানী অটুট রহিল।

কার্তিক: দেখলেন? আসুন, এমন ফুলদানী আর পাবেন না। দাম দশ টাকা পাঁচ আনা হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি পাঁচ টাকা দশ আনায় পাবেন। আসুন—

মেয়েটি সম্মোহিতের মত ফুলদানী হাতে লইল।

ওধারে গুটি চারপাঁচ মেয়ে বিজয়কে ছাঁকিয়া ধরিয়াছিল, কেবল অজিতা ও লক্ষ্মী একটু তফাতে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল। অজিতা মেয়েটি বেশী কথা কয় না, ফল্গু নদীর মত তাহার মন অন্তঃপ্রবাহিনী; ক্বচিৎ ভাবে-ইঙ্গিতে বা দু'একটি কথায় তাহার মনের রস ধরা পড়ে। লক্ষ্মীকে কনুই দিয়া স্পর্শ করিয়া সে হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

অজিতা: ওদের রকম দেখেছিস! মনে হচ্ছে যেন দোকানদারটিকেই কিনে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী অজিতার প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, লঘুস্বরে কহিল—

লক্ষ্মী: আর তা হয় না।

অজিতার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অজিতা: কেন, বিক্রী হয়ে গেছে বুঝি?

দু'জনের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল; লক্ষ্মী একটু ঘাড় নাড়িল।

ডিজল্‌ভ্‌।

. .

বিজয়া দশমীর রাত্রি।

কলিকাতার পথে পথে প্রতিমা বাহির হইয়াছে। লোকারণ্য।

দীপমালায় মহানগরী উজ্জ্বল। ঢাকিরা প্রতিমার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া আস্ফালন করিয়া ঢাক বাজাইতেছে—

কাট্।

বিজয়ের বাসা। বিজয় তক্তপোষের উপর এস্রাজ লইয়া বসিয়াছে, আপনার মনে একটি ভীমপলাশীর গৎ বাজাইয়া চলিয়াছে। দূরাগত ঢাকের শব্দ তাহার বাজনার সঙ্গে যেন তাল রাখিতেছে। সকল উৎসবের তালে তালে করুণরসের যে ক্ষীণস্রোত প্রবাহিত হয়, বিজয়ের এস্রাজ যেন সেই নিগূঢ় সুরটি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঢাকের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল; পূজার আনন্দ বিসর্জনের জলে বোধ করি নিমজ্জিত হইতেছে। বিজয় বাজনা শেষ করিয়া যন্ত্র সরাইয়া রাখিল।

মা পাশের ঘর হইতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

মা: হ্যাঁরে, আজ বিজয়া, তোর বন্ধুরা কেউ এল না।

বিজয় একটু ম্রিয়মান হাসিল।

বিজয়: তারা বোধহয় এবার কেউ আসবে না মা।

মা: কেন, ফি বছরই তো আসে!

বিজয়: এ বছর অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। আগে আমি ছাত্র ছিলুম সুতরাং ভদ্রলোক ছিলুম, এখন যে আমি দোকান-দার মা!

মা: দোকানদার তো কী! ব্যবসাদার কি ভদ্রলোক হয় না? এই যে কত বড় বড় ব্যবসাদার রয়েছেন—দেশের মাথা—তা এঁরা কি ভদ্রলোক নয়?

বিজয়: ঐ তো ভুল করলে মা। দোকানদার যতদিন গরীব থাকে ততদিন সে ছোট লোক; কিন্তু একবার বড়লোক হয়ে বসতে পারলে

আর তাকে ঠেকায় কে? কাঞ্চন-কৌলিন্যের জোরে আবার সে ভদ্র-লোক হয়ে বসে। কিন্তু আমি একে গরীব তায় দোকানদার, আমায় তো ত্যাগ করবেই—(নিশ্বাস ফেলিয়া) দাদা তো আগেই ত্যাগ করেছেন, একে একে আর সবাই ত্যাগ করছে। মা, শেষ পর্যন্ত কেবল তুমি আর আমি! আজ বিজয়ার রাত্রেও কেউ আমাদের মনে রাখল না!

ছেলের অন্তরগ্লানি মা নিজ অন্তরে অনুভব করিলেন। তিনি বিজয়ের কাছে বসিয়া একটা কিছু সান্ত্বনার কথা বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় বাহিরের দরজায় খুট্‌খুট্‌ করিয়া কড়া নড়িল। বিজয় চমকিয়া তাকাইল।

মা: (সানন্দে) এত কথা বল্‌লি, ঐ দ্যাখ কে বুঝি এসেছে।

বিজয় উঠিয়া দ্বারের দিকে গেল। হয়তো বাহিরের লোক হইতে পারে মনে করিয়া মা পাশের ঘরের দরজার দিকে সরিয়া গেলেন।

দ্বার খুলিয়া বিজয় ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল; এ যেন তাহার কল্পনারও অতীত! যে আসিয়াছিল সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—

আগন্তুক: আসতে পারি কি?

বিজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—

বিজয়: মা! দ্যাখো কে এসেছে!

লক্ষ্মী সলজ্জভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। মা ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। বিজয় উত্তেজনাবিহ্বল কণ্ঠে আরম্ভ করিল—

বিজয়: মা, জানো ইনি কে? ইনি হচ্ছেন—

মা: (সহাস্যে) জানি বাবা, তোমাকে আর পরিচয় দিতে হবে না। (লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া) এস মা লক্ষ্মী! তোমার কথা এত শুনেছি যে একশো মেয়ের মধ্যেও তোমাকে চিনে নিতে পারতুম—

লক্ষ্মী বিজয়ের দিকে একটি চকিতগোপন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া

মাযেব পাঁনে সলজ্জ চোখ তুলিল। মাযেব মুখখানি শান্ত প্রসন্ন, লক্ষ্মীর বড ভাল লাগিল ; সে ঈষৎ জডিত কণ্ঠে বলিল -

লক্ষ্মী : আমি আপনাকে বিজযার প্রণাম করতে এসেছি।

সে নত হইযা মাযেব পদধূলি লইল। মা তাহাকে বাঁ হাতে জডাইযা লইযা দক্ষিণহস্তেব কবাঙ্গুলি তাহাব চিবুকে স্পর্শ কবিযা চুম্বন কবিলেন।

মা : বেঁচে থাকো, বাজবাণী হও এস—বসবে এস।—(তক্তপোষে বসাইযা) বিজয, তুই এঁব সঙ্গে কথা ক, আমি মিষ্টি নিয়ে আসি।

বিজয এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইযাছিল, হাসিযা বলিল –

বিজয : মিষ্টিব দবকাব কি মা, আমাব পকেটে বোধহয চকোলেট আছে—

লক্ষ্মী তাহাব প্রতি ভ্রূভঙ্গ করিল , মা একটু হাসিলেন।

মা : নে. আব চালাকি কবতে হবে না। ওঁব সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল, আমি এখুনি আসছি।

মা পাশেব ঘবে গেলেন। বিজয তক্তপোষেব এক প্রান্তে বসিল।

বিজয : মা বলে গেলেন ভদ্রভাবে কথা কইতে। তা—শবীব গতিক বেশ ভাল ?—কাজ-কর্ম—?

লক্ষ্মী : সব ভাল।

এস্রাজটা তক্তপোষেব উপব পডিযাছিল তাহাব দিকে কটাক্ষপাত কবিযা লক্ষ্মী বলিল—

লক্ষ্মী : আপনি এস্রাজও বাজাতে পারেন।

বিজয এবাব অপ্রস্তুত হইযা পডিল, ঘাড চুল্‌কাইযা বলিল—

বিজয : বাজাতে পাবি না—কিন্তু বাজাই।

লক্ষ্মী : আপনার পেটে অনেক বিদ্যে আছে কিন্তু লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন।

বিজয়: আপনার পেটেও তো অনেক বিদ্যে আছে—আজ যে দীনের কুটীরে পদধূলি দেবেন, তার ইসারাও তো আগে দেননি।

লক্ষ্মী: কোথায় পদধূলি দেব তা কি আগে বল্‌তে আছে! লোকে ভয় পেয়ে যাবে যে।

বিজয় হাসিল, দু'জনের কৌতুক-বোধ প্রায় একই ধরণের, তাই পরস্পরের কথার রসগ্রহণ করিতে তাহাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। বিজয় কহিল—

বিজয়: পদধূলির কথায় মনে পড়ল। মা'কে তো খুব বিজয়ার প্রণাম করলেন। কিন্তু আমিও তো আপনার বয়সে বড়, আমি কি একটা বিজয়ার নমস্কারও প্রত্যাশা করতে পারি না?

অতঃপর লক্ষ্মী যাহা করিল তাহার জন্য সে নিজেও প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। হঠাৎ হেঁট হইয়া সে বিজয়ের পা ছুঁইয়া হাত নিজের কপালে ঠেকাইল। তাহার গায়ে একটু কাঁটা দিল। কিছুই তো নয়, বিজয়ার রাত্রে একজনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করা, কিন্তু লক্ষ্মীর মনে হইল—'আজু মঝু দেহ দেহ করি মানলু—'

বিজয় মহা বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়: ছি ছি, ও কী করলেন! আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম—

লক্ষ্মী বিজয়ের পানে একবার চোখ তুলিল, তারপর চোখ নামাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল—

লক্ষ্মী: আমি ঠাট্টা করিনি।—

মা মিষ্টান্নের রেকাবি ও জলের গেলাস হাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দু'জনে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া আছে! তিনি রেখাবি লক্ষ্মীর পাশে রাখিয়া বলিলেন—

মা: নাও মা, আজ একটু মুখে দিতে হয়।—বিজয়, তোর বাজনা

সরা। মা, তুমি আজ আমার ঘরে এসেছ, মনে হচ্ছে যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো এসেছে। এই খানিক আগে বিজয় দুঃখ করছিল—ও গরীব দোকানদার, তাই ওকে সবাই ত্যাগ করেছে। ভগবান তাই তোমাকে পাঠিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, সবাই ওকে ত্যাগ করেনি।—তুমিই বল তো মা, যে সৎপথে চলে—গরীব দোকানদার বলে তাকে কি কেউ ঘেন্না করতে পারে?

লক্ষ্মী মুখ তুলিল; মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মী: আমি পারি না। আমি যে নিজে দোকানদারের মেয়ে—দোকানদারের নাতনী—

মা কিছুক্ষণ উৎফুল্ল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন; বুঝি তাহার মনটিও স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি আসিয়া তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া নত হইয়া কপালে একটি চুম্বন করিলেন।

লক্ষ্মীর একটি হাত পিছন দিকে সরিয়া গিয়া এস্রাজটার উপর পড়িল। বাঁধা এস্রাজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ফেড্ আউট।

ফেড্ ইন্।

পূজার পর হপ্তাখানেক গত হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ তিনটা। ধনেশ নিজের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন. তাঁহার হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড। কার্ডে লেখা আছে—

লালা হংসরাজ—লাহোর

নীলাম্বর ধনেশের কাঁধের উপর দিয়া কার্ডটা দেখিয়া চক্ষু নাচাইলেন।

নীলাম্বর : হুঁ—লালা হংসরাজ। এমন উদ্ভুট্টে নামও শুনিনি কখনও।

ধনেশ : কে লোকটা ?

নীলাম্বর : কে জানে—খোট্টা-মোট্টা কেউ হবে।

চাপরাশি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ধনেশ তাহাকে বলিলেন—

ধনেশ : অপেক্ষা করতে বল।

চাপরাশি 'জি হুজুর' বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ধনেশ কার্ডটি তাচ্ছিল্যভরে টেবিলের উপর ফেলিয়া একটি আপেল তুলিয়া লইলেন।

অফিস ঘরের বাহিরে লালা হংসরাজ দাঁড়াইয়া আছেন। লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় আঁট-সাঁট পাগড়ী, বয়স অনুমান পঞ্চান্ন; কাঁচা-পাকা গোঁফ তাঁহার জোরালো মুখে একটা তেজস্বিতা আনিয়া দিয়াছে! তিনি একটু অধীরভাবে হাতের লাঠি মেঝেয় ঠুকিতেছেন; ললাট বিরক্তির রেখায় কুঞ্চিত হইয়াছে; কারণ কাহারও দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস নাই। চাপরাশি আসিয়া হাত উল্টাইয়া বলিল—

চাপরাশি : সবুর করনা হোগা।

হংসরাজের বিরক্তি বিস্মিত ক্রোধে পরিণত হইল।

হংসরাজ : ক্যা—সবুর! তুম হামারা কারড্ দিয়াথা ?

চাপরাশি : দিয়াথা—লেকেন—

হংসরাজ আর বাক্যব্যয় করিলেন না, দরজায় লাঠির টোকা মারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ধনেশ চমকিয়া মুখ তুলিলেন।

ধনেশ : এ কি! এ আবার কে ? কে তুমি ?

হংসরাজ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধনেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর টেবিলের কাছে আসিতে আসিতে বলিলেন—

হংসরাজ: আমার কার্ড আপনার সম্মুখেই আছে। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে আপনি কে?—মনোহরবাবু কোথায়?

হংসরাজ বাংলা ভালই বলিতেন; দোষের মধ্যে ভাষাটা একটু কেতাবী হইয়া পড়িত। পাঞ্জাবের অধিবাসী হইলেও ব্যবসায় সম্পর্কে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর সংসর্গে আসিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু চলিত বাংলা ভাষার বিচিত্র ও মধুর জটিলতা তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই!

ধনেশ হংসরাজের কথার উত্তরে বক্ত্র ঈষৎ বিভক্ত করিয়া চাহিয়া রহিলেন; নীলাম্বর বলিলেন—

নীলাম্বর: ইনি হলেন মনোহরবাবুর সুযোগ্য পুত্র রায় বাহাদুর ধনেশ রায়—দোকানের মালিক।

হংসরাজ: (চমকিয়া) আঁ! মনোহরবাবু তবে কি স্বর্গে গিয়েছেন?

নীলাম্বর: স্বর্গে নয়—আপাতত কাশী গিয়েছেন। আপনার কি দরকার বলুন।

উত্তর না দিয়া হংসরাজ আবার কিছুক্ষণ ধনেশকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন; সমীক্ষণ বোধ হয় সন্তোষজনক হইল না, তিনি একটু অপ্রসন্ন স্বরে ব'ললেন—

হংসরাজ: মনোহরবাবুর পুত্র! ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইতেছি। আমার প্রিয় বন্ধু মনোহরবাবু নিশ্চয় অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—নহিলে এত বড় কারবারের ভার—

ধনেশ ধৈর্য হারাইয়া রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

ধনেশ : আপনার বক্তৃতা শোনবার আমার সময় নেই। আমি কাজের লোক। যদি কিছু বলবার থাকে বলুন, নয়তো বিদেয় হোন—

হংসরাজের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত স্বরেই বলিলেন—

হংসরাজ : আপনার পিতা ওরূপভাবে আমার সহিত কথা ক'হতেন না। যাহা হোক, আমার প্রয়োজনের কথা বলিতেছি। আমি কিছু সাবান ও জুতোর কালি চাই।

ধনেশ : (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) সাবান! জুতোর কালি! কি রকম লোক আপনি? এই জন্মে আমার সময় নষ্ট করতে এসেছেন!

হংসরাজ : আপনি তবে দিতে পারিবেন না?

নীলাম্বর : (অপেক্ষাকৃত নরম সুরে) ওসব সামান্য জিনিস আমাদের দোকানে পাওয়া যায় না; আপনি বরং সামনের ঐ ছোট দোকানটাতে যান, ওখানে দু'চার পয়সার সওদা পাবেন।

হংসরাজ : উত্তম—তাহাই করিব, ধন্যবাদ।

দরজা পর্যন্ত গিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

হংসরাজ : একটি সামান্য কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি পাঁচ টন সাবান ও পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতার কালি কিনতে আসিয়াছিলাম। আমি অর্ডার—নমস্কার।

হংসরাজ বাহির হইয়া গেলেন। ধনেশ খানিক জবুথবু হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা আর্তনাদ করিলেন—

ধনেশ : অ্যাঁ—নীলাম্বর!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া হংসরাজ ফুটপাথে দাঁড়াইলেন। অন্তরে ক্ষোভপূর্ণ উষ্মা সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই; তিনি পকেট হইতে সিগার

কেশ বাহির করিলেন, কিন্তু খুলিয়া দেখিলেন সিগার ফুরাইয়াছে। এদিক ওদিক চোখ ফিরাইতে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের প্রতি নজর পড়িল! তিনি তখন রাস্তা পার হইয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে চলিলেন, গলার মধ্যে অস্ফুট ক্ষোভের স্বরে কহিলেন—

হংসরাজ: বৎতমিজ বুদ্ধু।

বিজয় কাউণ্টারে ছিল, হংসরাজ উপস্থিত হইতেই মিষ্ট হাসিয়া সে তাহার স্বল্পসঞ্চয় হিন্দী বুলি খরচ করিয়া ফেলিল—

বিজয়: আইয়ে—ফরমাইয়ে—

হংসরাজ চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন; তারপর পর শুদ্ধ বাঙলায় বলিলেন—

হংসরাজ: সিগার চাই—ভাল সিগার আপনার দোকানে আছে কি?

এবার বিজয়ও চোখ তুলিয়া চাহিল।

বিজয়: আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈকি। একেবারে নতুন চালান—এই যে।

সে এক বাক্স সিগার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল; হংসরাজ দ্বিধাভরে নিরীক্ষণ করিলেন—

হংসরাজ: এ কি ভাল সিগার? হাভানা গোল্ড লীফ ব্রাণ্ড নাই?

বিজয়: আজ্ঞে না, ও ব্রাণ্ডটা আমার কাছে নেই। কিন্তু আপনি এই একটা ট্রাই করে দেখুন. আমার বিশ্বাস মন্দ লাগবে না!

হংসরাজ তবু ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া বিজয় বলিল—

বিজয়: আপনি একটা নিন, যদি পছন্দ না হয় দাম দেবেন না।

হংসরাজ আবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিজয়কে দেখিলেন, তারপর একটি সিগার তুলিয়া লইতে লইতে বলিলেন—

হংসরাজ: আপনিই কি এই দোকানের মালিক?

বিজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিজয় দেশলাই জ্বালিয়া হংসরাজের সিগার ধরাইয়া দিল।

হংসরাজ : হুঁ—কতদিন দোকান করিতেছেন ?

বিজয় : এই মাত্র তিন মাস।—কেমন লাগছে সিগারটা ?

হংসরাজ : ভালই। দাম কত ?

বিজয় : খুচরো দাম চার আনা। যদি পুরো বাক্স কেনেন, দু'টাকা বারো আনা পড়বে।

হংসরাজ একবার বিজয়কে দেখিলেন, একবার পিছু ফিরিয়া মনোহর ভাণ্ডারকে দেখিলেন, তারপর দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

হংসরাজ : আপনার সহিত আমি কিছু কথা বলিতে চাই।

বিজয় একটু অবাক হইল, তারপর সসম্ভ্রমে বলিল—

বিজয় : বেশ তো আসুন না, ভেতরে আসুন।—এই যে বাঁ দিকে দরজা—

কাট্।

ধনেশের অফিস ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া নীলাম্বর এই দৃশ্য দেখিলেন তারপর অধর দংশন করিয়া সরিয়া গেলেন।

ধনেশ নিজের টেবিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, নীলাম্বরের পানে উদ্বিগ্ন মুখে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—

নীলাম্বর : দেখছ কি, আমাদের বাঁধা খদ্দের ভাঙিয়ে নিলে। উঃ, পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতোর কালি—

ধনেশ হাপরের মত দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধনেশ : পাঁচ টন সাবান !

কাট।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে লালা হংসরাজ ও বিজয় টেবিলের দুই পাশে বসিয়াছেন : বিজয়ের মুখে বিহ্বল বিস্ময়।

বিজয় : পাঁচ টন সাবান !

হংসরাজ তৃপ্তমুখে সিগারে টান দিলেন।

হংসরাজ : এবং পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতার কালি। আপনি ঠিকা লইতে প্রস্তুত আছেন ?

বিজয় : রাজি! এতবড় সুযোগ আপনি আমায় দিচ্ছেন আর আমি রাজি হব না! কিন্তু—কিন্তু—এতবড় কণ্ট্রাক্ট নেবার মত টাকা তো আমার নেই ; আমার যা-কিছু সব এই দোকান।

হংসরাজ : আপনি যদি ঠিকা লইতে প্রস্তুত থাকেন, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিব।

অভাবনীয় সৌভাগ্যও মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে ; বিজয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিজয় : পাঁচ—হাজার টাকা আপনি আমায় বিশ্বাস করে দেবেন ? যদি আমি জুচ্চুরি করি ? যদি আপনার টাকা ঠকিয়ে নিই। আমাকে তো আপনি চেনেন না।

হংসরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

হংসরাজ : ইয়ংম্যান, আমি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ব্যবসা করিতেছি, মুখ দেখিয়া মানুষ চিনিতে পারি। আসুন, চুক্তিপত্র লেখা যাক্--

তিনি পকেট হইতে কয়েকটি ছাপা ফর্ম বাহির করিলেন। বিজয় হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল !

বিজয় : আমি নিজে সাবান তৈরী করব ; এই পেছনের ঘরগুলো ভাড়া নিয়ে কারখানা করব।—আপনার আপত্তি নেই তো ?

হংসরাজ : (হাসিয়া) আপত্তি কি! আমার specification

অনুযায়ী মাল পাইলেই হইল। আপনি নিজে মাল তৈয়ার করিলে আপনারও বেশী লাভ থাকিবে।

অতঃপর উভয়েই চুক্তিপত্র রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ডিজল্‌ভ্‌

ধনেশের অফিস ঘরের জানালায় নীলাম্বর আবার আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সম্মুখে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। হংসরাজ পরম সমাদরের সহিত বিজয়ের করমর্দ্দন করিয়া ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিলেন; ট্যাক্সি চলিয়া গেল। বিজয় হাস্যবিম্বিত মুখে আবার দোকানে প্রবেশ করিল।

জানালায় দাঁড়াইয়া নীলাম্বর দৃশ্যটি দেখিলেন এবং সক্রোধে চক্ষু নাচাইলেন। তারপরই তাঁহার চক্ষু একেবারে স্থির হইয়া গেল। অতীব বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, লক্ষ্মী একটু সতর্কভাবে গিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নীলাম্বর শ্বাপদের মত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এতদিন তাঁহার কাছে যাহা রহস্যে আবৃত ছিল তাহা আজ জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি ধনেশের দিকে ফিরিলেন।

কাট্।

দোকানের মধ্যে বিজয় চুক্তিপত্রটি দু'হাতে ধরিয়া মহা আগ্রহে পাঠ করিতেছিল; বারংবার পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। এমন সময় লক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া সে প্রায় নাচিতে নাচিতে চুক্তি পত্রটি উর্দ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বিজয় : চিকা চিকা বুম্! দেখছেন কি, পাঁচ টন সাবান! আরও শুনতে চান? পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতোর কালি—চিকা চিকা বুম্!

লক্ষ্মী অবাক ; কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী : হঠাৎ হল কী আপনার! মাথায় পোকা-টোকা কিছু ঢুকেছে নাকি?

বিজয় : পোকা নয়—পোকা নয়, এই স্থাখো—(চুক্তিপত্র পড়িয়া) লালা হংসরাজ, নিশাৎ রোড, লাহোর। প্রকাণ্ড ব্যবসাদার—আমি কণ্ট্রাক্টর—! জয় লালা হংসরাজ জিন্দাবাদ!

বিজয়ের পাগলামি দেখিয়া লক্ষ্মী তাহার হাত হইতে চুক্তিপত্রটি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিজয় কিন্তু স্থির থাকিবার পাত্র নয়, সে পকেট হইতে একটা চেক বাহির করিয়া লক্ষ্মীর মুখের সামনে নাড়িতে নাড়িতে বলিল—

বিজয় : শুধু কি ঐ? এদিকে স্থাখো—পাঁচ হাজার টাকার চেক্—অগ্রিম! (লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া টানিয়া) এস এস, সব কথা বলি তোমাকে—আশ্চর্য ব্যাপার - রূপকথার মত গল্প—

বিজয় লক্ষ্মীকে নিজের টুলে লইয়া গিয়া বসাইল, নিজে প্যাকিং বাক্স টানিয়া তাহার মুখোমুখি বসিল। লক্ষ্মীর অধরের কূলে কূলে হাসি উছলিয়া উঠিতেছে, চোখে অপূর্ব দীপ্তি। আজ নিজেরই অজ্ঞাতসারে বিজয়ের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিয়া আসিয়াছে।

লক্ষ্মী : পাগ্লামি কোরো না, আস্তে আস্তে বল।

বিজয় উদ্দীপ্ত চক্ষে লক্ষ্মীর পানে চাহিল। নিজের মুখের যে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন তাহার নিজের কানে ধরা পড়ে নাই, লক্ষ্মীর মুখ

হইতে তাহাই আনন্দের তীর হইয়া তাহার বুকে বিঁধিল। সে দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়: লক্ষ্মী—!

বিজয়ের কণ্ঠস্বরে আনন্দের সহিত একটি ব্যগ্র প্রশ্নও নিহিত ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে, একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লক্ষ্মী নিজের হাত দুটি বিজয়ের প্রসারিত হাতের মধ্যে সমর্পণ করিয়া দিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। কাজকর্ম চলিতেছে। সিঁড়ির পাশে নীলাম্বর রেলিংয়ের উপর কনুই রাখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে আছেন এবং চিবুকে হাত বুলাইতেছেন।

বিজয়ের দোকান হইতে ফিরিয়া লক্ষ্মী সদর দরজা দিয়া মনোহর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা ছিল অলক্ষিতে উপরে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু নীলাম্বরকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। যাহোক, নীলাম্বরের কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। লক্ষ্মী চুপি চুপি তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

দু'ধাপ উঠিতে না উঠিতেই নিলাম্বর চমকিয়া যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন।

নীলাম্বর: ও—এই যে মা—লক্ষ্মী। তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন—অফিস ঘরে।

বলিয়া তিনি চক্ষু নাচাইলেন। লক্ষ্মী একবার চমকিয়া তাঁহার পানে তাকাইল, তারপর নীরবে নামিয়া অফিস ঘরের দিকে গেল। নীলাম্বর চক্ষু নাচাইতে নাচাইতে তাহার অনুগামী হইলেন।

অফিস ঘরে ধনেশ বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন;

লক্ষ্মী গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর গল্লার মধ্যে একটি গুরুগম্ভীর শব্দ করিয়া আরম্ভ করিলেন—

ধনেশ : আমি শুনলুম তুমি ঐ দোকানটাতে গিয়েছিলে?

সংবাদটি তিনি কাহার মুখে শুনিয়াছেন তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। লক্ষ্মী নীলাম্বরের প্রতি একটি কবোষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সংক্ষেপে বলিল—

লক্ষ্মী : হাঁ গিয়েছিলুম।

ধনেশ : এই প্রথম না আগেও গিয়েছ?

লক্ষ্মী : কয়েকবার গিয়েছি।

ধনেশ : হুঁ। ওখানে যাবার তোমার কী দরকার? নিজের দোকানের জিনিস পছন্দ হয় না?

লক্ষ্মী : নিজের দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায় না।

ধনেশ ইহার উত্তরে কী বলিবেন খুঁজিয়া না পাইয়া নীলাম্বরের পানে চাহিলেন।—

নীলাম্বর : সে কি কথা মা-লক্ষ্মী! তোমার যে-জিনিস দরকার দোকানে পাওয়া যাক না যাক, আমাকে একটা ফিরিস্তি ক'রে পাঠিয়ে দিলেই আমি যেখান থেকে হোক যোগাড় করে এনে দিতে পারি। তোমাকে পরের দোকানে যেতে হবে কেন?

এ কথার উত্তর নাই। লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ধনেশ গুরু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

ধনেশ : না না, এসব ভাল কথা নয়। তোমার যেখানে সেখানে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

লক্ষ্মী উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিল, কিন্তু তৎপূর্বে নীলাম্বর তৈল মসৃণ কণ্ঠে বলিলেন—

নীলাম্বর : তা ছাড়া, জিনিস কিনতেই যদি হয়, তা দোকানের বাইরে থেকেও কেনা যেতে পারে—ভেতরে যাবার কী দরকার, মা-লক্ষ্মী ?

ধনেশ : হ্যাঁ, ভেতরে যাবার কী দরকার ?

নীলাম্বর : তুমি কত বড় বাপেব মেয়ে সেটাও তো মনে রাখা দরকার। যার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা—

ধনেশ : হ্যাঁ—আমার মেয়ে হয়ে তুমি ঐ একটা—ঐ একটা—অ্যাঁ নীলাম্বর—?

নীলাম্বর : ঠিকই তো, ঐ একটা বাজে লোকেব সংস্পর্শে আসা কখনই উচিত নয়। কথায় বলে ঘি আব আগুন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধনেশ ও নীলাম্বরের মুখের পানে চক্ষু ফিরাইতে ছিল, এবাব তাগাব দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী : আপনি কার কথা বলছেন ?

নীলাম্বর : বুঝতেই তো পেবেছ মা-লক্ষ্মী—ঐ চ্যাংড়া দোকানদারটা।—অতি বদ লোক। ওব ছায়া মাড়ানো তোমার উচিত নয়।

ধনেশ : কখনই না। আমি তোমাকে মানা করে দিলুম—আর ওদিকে যাবে না। পাজি শয়তান লোকটা। যাও—ওপরে যাও। ফের যেন আমাকে একথা বলতে না হয়।

লক্ষ্মী অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া শুনিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, ঐ লোকটি পাজি শয়তান বলিয়াই কি উহার পিছনে গুণ্ডা লাগানো হইয়াছিল ? কিন্তু ওকথা বলিলে ঐ সূত্রে আরও অনেক কথা উঠিয়া পড়িবে, তাহাতে বিপদ আছে। লক্ষ্মী মুখ টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধনেশ পৈতৃক কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন মনে করিয়া সানন্দে একটি আপেল তুলিয়া লইলেন।

ধনেশ : কি রকম ধমক দিয়েছি দেখলে তো—মুখে কথাটি নেই। আর ওদিকে পা বাড়াবে না।

নীলাম্বর কিন্তু মুখ ছুঁচালো করিয়া এমন একটি ভাব দেখাইলেন যাহাতে মনে হয় এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই।

এই সময় চাপরাশি বৈকালিক ডাকের চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল; কয়েকটি বিজ্ঞাপনের বুক-পোষ্ট এবং একখানি খামের চিঠি। ধনেশ ভ্রূকুটি করিয়া খাম ছিঁড়িলেন।

ধনেশ : বাবার চিঠি।

চিঠি পড়িয়া ধনেশের মুখ আরও অন্ধকার হইল।

ধনেশ : বাবা লিখেছেন, অডিটার ডাকিয়ে দোকানের হিসেবপত্র পরীক্ষা করাতে।

নীলাম্বর চক্ষু হঠাৎ আশঙ্কায় নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বরের : অডিটার! আবার এসব হাঙ্গামা কেন? মিছিমিছি কতগুলো টাকা নষ্ট। এতো আর লিমিটেড কোম্পানী নয় যে অডিট করাতেই হবে—

ধনেশ : সে কি আর আমি জানি না! কিন্তু বাবার এক খেয়াল, চিরকাল হয়ে এসেছে, এবারও হওয়া চাই—

নীলাম্বর : তোমার বাবা যদি নিজের হাতেই সব রাখতে চান, তাহলে তোমার হাতে ভার দেবার এই মিথ্যে ভড়ং করবার কি দরকার? আর আমিই বা এমন প্রাণপাত করে খেটে মরছি কেন? তিনি নিজেই এসে নিজের দোকান দেখুন। আমাদের ওপর যখন তাঁর বিশ্বাস নেই—

ধনেশ ফোঁস করিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ধনেশ : তুমি যথার্থ বলেছ নীলাম্বর, বুড়ো হয়ে বাবার মনটা বড় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে—এই যে চিঠি পড়ে ছাখো না—

চিঠি লইয়া নীলাম্বর অসন্তুষ্ট মুখে পড়িতে লাগিলেন ; পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষু ক্রমাগত নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

ফেড্ আউট !

ফেড ইন

কয়েক দিন পরের ঘটনা।

প্রায় মধ্য রাত্রি। বিজয়ের দোকানের পিছনে গুদামের মত একটা বড় ঘর। ঘরের এক পাশে সারিসারি দশ বারোটা উনানের উপর মস্ত বড় বড় লোহার কড়া, কড়ার কানায় কানায় তরল সাবান টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। প্রত্যেক কড়ার কাছে একজন হাফপ্যাণ্ট পরা যুবক দাঁড়াইয়া আছে ; ইহারা বিজয়ের দ্বারা নিযুক্ত বিজ্ঞানবিৎ টেকনিশিয়ান—ইহারাই সাবান ও জুতার কালি প্রস্তুত করিতেছে। বিজয় ও লক্ষ্মী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ কড়া হইতে ও কড়া পরিদর্শন করিয়া বেড়াতেছে।

ঘরের অন্য কোণে এক কড়া জুতার কালি নামিয়াছে, কয়েকজন কর্মী মিলিয়া তাহাই ছোট ছোট কৌটায় ভরিয়া বন্ধ করিতেছে। বিজয় ও লক্ষ্মী সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় আঙুল দিয়া কটাহের গাঢ় পদার্থ একটু তুলিয়া লইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে টিপিয়া দেখিল, তারপর প্রধান কর্মীকে বলিল—

বিজয় : একটু পাৎলা মনে হচ্ছেনা ?

প্রধান কর্মী : (মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে না, এখনও গরম আছে, ঠাণ্ডা হলেই জমে যাবে।

বিজয় : ও—

সেখান হইতে তাহারা ঘরের অন্যদিকে গেল। এখানে ছাঁচে

সাবান ঢালাই করা হইয়াছে—অগণিত লম্বা কাঠের ছাঁচ মেঝেয় সাজানো রহিয়াছে। বিজয় ও লক্ষ্মী সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই একজন কর্মী একটি ছাঁচ খুলিয়া লম্বা চৌকশ একটি সাবানের 'বার' বাহির করিল, সেটি দুহাতে লইয়া হাস্যমুখে বিজয়ের সম্মুখে ধরিল। বিজয় সেটি অঞ্জলিপুটে লইয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে ধরিল।

বিজয়: আমাদের প্রথম সৃষ্টি। সাবানের নাম কি রেখেছি জানো? লক্ষ্মী সাবান।

লক্ষ্মী পরম স্নেহভরে সাবানটিকে নিজের হাতে তুলিয়া লইল; যেন এটি তাহার প্রথম শিশু। পরস্পরের পানে চাহিয়া দুজনের মনেই মধুর রসাবেশ ঘনাইয়া উঠিল। এ যেন তুচ্ছ সাবান নয়, তাহাদেব মিলিত ভালবাসার প্রথম ফল।

কার্তিক ইতিমধ্যে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—

কার্তিক: কিন্তু স্যার, জুতার কালির তো কোনও নাম রাখ্‌লেন না?

বিজয়: না, এখনও ঠিক করতে পারিনি। কী নাম রাখি বল তো লক্ষ্মী।

কার্তিক: (সোৎসাহে) আমি বলি স্যার?—বিজয় বুট্‌ ব্ল্যাক!

লক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল। বিজয় কপটক্রোধে নিজের কালিমাখা হাত কার্তিকের গালে মুছিয়া দিয়া বলিল—

বিজয়: পাজি ছেলে। আমি বুট ব্ল্যাক্‌!

কার্তিক কালিমাখা গাল সবেগে ঘষিতে ঘষিতে বলিল—

কার্তিক: ঐ-যা স্যার, আপনি আমার গাল বার্ণিশ করে দিলেন। এ কি আর উঠবে?

লক্ষ্মী: ভাবিসনে কার্তিক, লক্ষ্মী সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলিস, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বলিয়া সাবানটি কার্তিককে দিল।

ঘর্ষণের ফলে কার্তিকের গালের কালি মুখময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে ভাল্লুকের মত শাদা দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল—

কার্তিক : চিকা চিকা বুম্‌।

বিজয় তাহার মূর্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয় : ঠিক হয়েছে! কালির নাম রইল -কার্তিক কালি। কেমন, বেশ মানানসই হয় নি ?

বাহিরে কোনও গির্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। বিজয় নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া লক্ষ্মীর পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিতেই লক্ষ্মী একটু ঘাড় নাড়িল।

লক্ষ্মী : হ্যাঁ, এবার যেতে হবে—যদিও যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

বিজয় : আমারও যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আর বেশী রাত করলে –

লক্ষ্মী : ধরা পড়ার ভয়! আচ্ছা চললুম। চুপি চুপি খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যাব, কেউ জানতে পারবে না।

বিজয় : চল তোমাকে রাস্তা পার করে দিয়ে আসি।—কার্তিক আমি এখনি আসছি।

দু'জনে বাহির হইয়া গেল।

কাট্‌।

লক্ষ্মীর শয়ন-ঘর। ধনেশ স্থূল শরীরে একটি ডোরাকাটা স্লীপিং-স্যুট পরিয়া ঘরে পায়চারি করিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু ঘূর্ণিত করিতেছেন। আজ তাঁহার শরীর ভাল ছিল না—মাথা ধরিয়াছিল।

মনও খারাপ যাইতেছিল; কারণ তাঁহার স্থূলবুদ্ধিতেও ক্রমশ ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল যে দোকান যেমন চলা উচিত তেমন চলিতেছে না, ভিতরের একটা মস্ত গলদ বাহিরের চাকচিক্যে চাপা পড়িয়া আছে। উপরন্তু আজিকেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের হতভাগ্য দোকানদার সাবানের কারখানা করিয়াছে। নিজের ব্যর্থতার সমস্ত আক্রোশ বিজয়ের উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার ঘুম আসে নাই—অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পর তিনি উঠিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গিয়াছিলেন—ঘুমের বড়ির সন্ধানে। স্বভাবতই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে লক্ষ্মী নিজের শয্যায় ঘুমাইতেছে। কিন্তু কন্যাকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর অনূঢ়া কন্যা কোথায় গেল? ধনেশ দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন কিন্তু লক্ষ্মী ফিরিয়া আসে নাই। তখন তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বামহস্তের করতলে একটি প্রচণ্ড কিল মারিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন বুদ্ধির আকাশে বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া গিয়াছিল—কন্যা তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া প্রেম করিতেছে এবং কাহার সহিত প্রেম করিতেছে তাহাও তিনি ঐ চকিত বিদ্যুৎচমকের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যত দেরি হইতেছে, ধনেশের মাথা ততই আণবিক বোমার মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। তিনি একবার রাস্তার দিকের জানালাটা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, তারপর জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বাম করতলে আবার সবেগে মুষ্টিপ্রহার করিলেন।

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের পিছনকার দরজার কাছে নির্জন ছায়ান্ধকার ফুটপাথের উপর লক্ষ্মী ও বিজয় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর হাতদুটি বিজয়ের মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ।

লক্ষ্মী : হাত ছাড়ো, যাই।

বিজয় : বল, আসি।

লক্ষ্মী : আসি।

বিজয় : কাল আবার আসবে ?

লক্ষ্মী : আসব। সন্ধ্যের পর।

বিজয় : সমস্ত দিন দেখতে পাব না ?

লক্ষ্মী হাসিল।

লক্ষ্মী : মাঝে মাঝে জানালার দিকে তাকিয়ো হয়তো দেখতে পাবে।

বিজয় : আচ্ছা। মানুষ যেমন আকাশের চাঁদ ভাখে, মন্দিরের চূড়া ভাখে, তেমনি তোমায় দেখব।

রাত ভিখারীর মত একটা লোক—গায়ে মলিন রঙের কম্বল জড়ানো—পাশ দিয়া চলিয়া গেল। বিজয় ও লক্ষ্মী তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

বিজয় : আচ্ছা লক্ষ্মী, এ কী হল ?

লক্ষ্মী : কিসের কী হল ?

বিজয় : এই যে তোমাতে আমাতে। আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। কি করে সম্ভব হল ?

লক্ষ্মী : অনিবার্য বলেই সম্ভব হল—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে!

বিজয় : কিন্তু এর শেষ কোথায় লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী বিজয়ের একেবারে বুকের কাছে সরিয়া আসিল।

লক্ষ্মী : যেখানে আরম্ভ হয়েছিল সেইখানেই এর শেষ।

বিজয় : কোথায় ?

লক্ষ্মী : তোমার আর আমার বুকের মধ্যে—এইখানে।

লক্ষ্মী ক্ষণেকের জন্য বিজয়ের বুকের উপর মাথা রাখিল, তারপর চকিত প্রজাপতির মত ছায়ান্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিজয় কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের দোকানে ফিরিয়া গেল।

কাট্।

লক্ষ্মীর শয়ন-ঘরের মধ্যস্থলে ধনেশ বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া গম্বুজের মতন দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাহিরে লঘু পদশব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃশব্দে গিয়া বড় আলোটি নিভাইয়া দিলেন, কেবল নৈশ আলোটি মৃদু জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

বাহিরের বারান্দাটি প্রায় অন্ধকার, লক্ষ্মী চাকরদের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অতি সন্তর্পণে নিজের শয়ন ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা ধনেশকে সে দেখিতে পাইল না, ধনেশ সুইচের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সুইচ টিপিতেই দপ্ করিয়া বড় আলো জ্বলিয়া উঠিল। লক্ষ্মী চমকিয়া দেখিল, সাক্ষাৎ বাবা! তাহার অঙ্গ হঠাৎ হিম হইয়া গেল।

ধনেশ কণ্ঠস্বর চাপিবার চেষ্টায় দর্দুরধ্বনিবৎ একটি আওয়াজ বাহির করিলেন—

ধনেশ : কোথায় গিছলে এত রাত্রে—এঁ্যা!

লক্ষ্মীর কোনও কৈফিয়ৎ তৈরী ছিল না, সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

লক্ষ্মী : আমি—আমি—

ধনেশের দর্দুরধ্বনি আরও কর্কশ হইয়া উঠিল।

ধনেশ : মিথ্যে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা কোরোনা, আমি সব জানি।—নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, আমার মুখে চুণকালি দিচ্ছ ?

লক্ষ্মীর হঠাৎ ধরা পড়ার কুণ্ঠা কাটিয়া গেল, তাহার মেরুদণ্ড শক্ত হইয়া উঠিল। এরূপ ঘৃণ্য অপবাদ সে পিতার নিকট হইতেও সহ্য করিবে না। ধনেশের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল—

লক্ষ্মী : আমি কারুর মুখে চুণকালি দিইনি।

ধনেশ : তবে ঐ পাজি বজ্জাতের দোকানে এত রাত্রি পর্যন্ত কী করছিলে, অ্যাঁ ?

লক্ষ্মী : (আরক্তমুখে) উনি বজ্জাত নয়—ভাল লোক।

ধনেশ : কী, এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার শত্রুর পক্ষ হয়ে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

লক্ষ্মী : উনি তোমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেন নি, তোমরাই ওঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছ।—ওঁর পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছিলে—

ধনেশের চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তিনি তম্বি হাঁক-ডাক করিতে পটু কিন্তু তর্কের মুখে পড়িলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। লক্ষ্মীর এই অতি সত্য অভিযোগ তিনি খণ্ডন করিতে পারিলেন না ; শেষে আরও গলা চড়াইয়া বলিলেন—

ধনেশ : আমার কথার ওপর কথা—বাপের মুখের ওপর চোপা—অ্যাঁ ! আমি সহ্য করব না। আমার বাড়ীতে থেকে কেউ আমার অবাধ্য হতে পারবে না !—

লক্ষ্মী : বেশ, কালই আমি কাশীতে দাদুর কাছে চলে যাব।

এতক্ষণ ধনেশ যদি বা নিজেকে একটু সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবার আর পারিলেন না, আণবিক বোমা একেবারে ফাটিয়া পড়িল। তিনি লক্ষ্মীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

ধনেশ : কাশী চলে যাবে? দাদুর কাছে চলে যাবে? বটে! দাদুর কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাবে! বজ্জাত মেয়ে, আমার সঙ্গে চালাকি! ঘরে বন্ধ করে রাখব তোমাকে, জ্যান্ত মাটিতে পুঁত্‌ব, খুন করব—

ধনেশের কথাগুলি বহুলাংশে শব্দালঙ্কার হইলেও তাঁহার কণ্ঠস্বর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় অনেক দূর সঞ্চারিত হইয়াছিল, দূরের ঘরে আহ্লাদী বুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে আলুথালু অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিয়া কাণ্ড দেখিয়া একেবারে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

আহ্লাদী : ওমা আমি কোথায় যাব। হ্যাঁরে ধনু, দুপুর রাত্রে তোর একি কাণ্ড। কী হয়েছে।

ধনেশ : চুপ করে থাক বুড়ি, নইলে তোরও গলা টিপে দেব।

বুড়ী মুহূর্তে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করিল।

আহ্লাদী : কি বল্‌লি র‍্যা—আমার গলা টিপে দিবি! তবে রে হাড়-হাবাতে, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি, তুই আমার গলা টিপে দিবি! দে না দেখি কত বড় তোর ক্ষ্যামতা—

লক্ষ্মী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

লক্ষ্মী : চল্‌ দিদি, আজ রাত্তিরেই আমরা দাদুর কাছে চলে যাই।

ধনেশের ঠোঁটের কোণে ফেনা দেখা দিল; তিনি লক্ষ্মীর বাঁ

হাতখানা ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে দ্বারের দিকে লইয়া চলিলেন—

ধনেশ : এই যে যাওয়াচ্ছি দাদুর কাছে। সব বজ্জাতি বার করব আজ—

ধনেশ ঘরের বাহিব হইয়া লক্ষ্মীকে বারান্দার ওপ্রান্তে আর একটা ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বুড়ী চিল-চীৎকার করিতে করিতে পিছনে চলিল—

আহ্লাদী : ওরে সর্ব্বনেশে গাড়োল, তোর কি ভিমরতি ধরেছে? মেয়েটাকে কোথায় টেনে নিয়ে চল্লি—শেষে কি মেরে ফেল্বি নাকি রে—

একটা অন্ধকার ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা ছিল; ইহা আহ্লাদীর ঘর। ধনেশ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন, তারপর বুড়ীকেও ঘাড় ধবিয়া ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিলেন।

ধনেশ : যা—এবার কাশী যা।

কাট্।

অন্ধকার ঘরেব মধ্যে কেবল আহ্লাদী বুড়ীর মৃদু কুন্থন শুনা যাইতেছে। লক্ষ্মী দেয়াল হাতড়াইয়া সুইচ্ টিপিল; আলো জ্বলিল। দেখা গেল ঘরটিতে আস্‌বাব বিশেষ কিছু নাই, কেবল একটি চৌকির উপর বুড়ীর বিছানা রহিয়াছে। ঘরটিকে সিন্দুক বলিলেও চলে, কারণ জানালা নাই, কেবল উর্ধ্বে একটি স্কাই লাইট্।

বুড়ী মেঝেয় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, সেইখানেই পড়িয়া কোঁথাইতেছিল। লক্ষ্মী গলদশ্রুনেত্রে তাহার

পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে সযত্নে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

লক্ষ্মী : দিদি—আয়—উঠে বস্।

ডিজল্ভ্।

তিন দিন কাটিয়াছে। ভূত চতুর্দশীর প্রভাত; আগামী কল্য শ্যামাপূজা ও দেয়ালী।

বিজয়ের দোকানের সম্মুখে একটি ঠেলাগাড়ি রহিয়াছে। কয়েকজন মজুর দোকান হইতে সাবানভরা প্যাকিং বাক্স বহিয়া আনিয়া ঠেলাগাড়িতে বোঝাই করিতেছে। বিজয় খাতা পেন্সিল লইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে এবং হিসাব লিখিয়া লইতেছে!

হিসাব লেখার ফাঁকে ফাঁকে বিজয় উৎকণ্ঠিত ভাবে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বিতলে লক্ষ্মীর জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। লক্ষ্মীর জানালা কিন্তু বন্ধ; আজ তিন দিন জানালা বন্ধ আছে, লক্ষ্মীরও দেখা নাই।

আমাদের পরিচিত বৃদ্ধটি কার্তিকের কাউণ্টারে নস্য কিনিতেছেন এবং চশমার ভিতর দিয়া বিজয়কে লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার সাজ পোষাক পূর্ববৎ আছে, কেবল বর্ষা অপগত হইয়া শীতের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি বরষাতিটি বর্জন করিয়া একটি অতি প্রাচীন ওভারকোট্ পরিধান করিয়াছেন।

কার্তিকের হাত হইতে নস্যের পুরিয়া লইয়া তিনি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

বৃদ্ধ : তোর মনিবের হয়েছে কি? মুখ গোম্‌ড়া করে আছে কেন?

কার্তিকও মুখ গম্ভীর করিল।

কার্তিক : বিজয়বাবুর মন খারাপ হয়েছে।

বৃদ্ধ : তা তো দেখতেই পাচ্চি। কিন্তু মন-খারাপটা হল কেন ?

কার্তিক : (চুপি চুপি) ও বাড়ির লক্ষ্মী দিদি তিন দিন আসেন নি কি না, তাই মন খারাপ হয়েছে।

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া একবার কার্তিককে দেখিলেন, তারপর গলার মধ্যে একটা শব্দ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

এই বৃদ্ধটির প্রকৃত পরিচয় বোধ করি এতক্ষণে সকলেই অনুমান করিয়াছেন।

মনোহর রায় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন; কি করিয়া অতি সামান্য আরম্ভ হইতে এই বৃহৎ ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আমরা শুনিয়াছি। অতঃপর তাঁহার বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছর হইল তখন তাঁহার মস্তকে পরকালের চিন্তা আসিয়া জুটিল। কিন্তু পরকালের চিন্তাকে মস্তিষ্কে স্থায়ী আসন দান করিতে হইলে সেখান হইতে ইহকালের চিন্তাকে সরাইতে হয়; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অবর্তমানে দোকান চালাইবে কে ? একমাত্র পুত্র ধনেশের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে মনোহরের মনে কোন মোহ ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর দোকানের কী অবস্থা হইবে ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

শেষে অনেক চিন্তার পর মনোহর স্থির করিলেন, নিজের জীবদ্দশাতেই ধনেশের হাতে দোকানের ভার দিয়া তাহাকে হাতে-কলমে ব্যবসা শিখিবার সুযোগ দিবেন। যদি সে নিতান্তই না চালাইতে পারে তখন অন্য ব্যবস্থা করিবার অবকাশ থাকিবে।

ধনেশের হাতে দোকান পরিচালনার ভার তুলিয়া দিয়া তিনি একটি অনুগত কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাস করিলেন; কিন্তু সেখানে বেশী দিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুকের রক্ত দিয়া

গড়া দোকানের চিন্তা তাঁহার ভগবৎ চিন্তা ভুলাইয়া দিল। মাস দুই পরে তিনি লুকাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া দোকানের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনবার্তা কেহই জানিতে পারে নাই; কাশীতে কর্মচারীটি তাঁহার চিঠিপত্র নিয়মিত তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিত, তিনি সেইসব চিঠি-পত্রের জবাব লিখিয়া কাশীতে কর্মচারীর কাছে ফেরৎ পাঠাইতেন; কর্মচারী চিঠিগুলি নূতন খামে ভরিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিত। এইরূপে মনোহরের অজ্ঞাতবাস কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারে নাই। কেবল প্রভুভক্ত হনুমান সিং জানিতে পারিয়া-ছিল। হনুমান সিংয়ের চরিত্রে আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিজয়কে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার মূলে যে মনোহর আছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

ধনেশের দোকান চালাইবার পদ্ধতি মনোহর বাহির হইতে যতখানি দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উদ্বেগ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু তবু তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ধনেশের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, শেষ পর্যন্ত তাহাকে ভ্রমসংশোধনের সুযোগ দিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কেবল মনের উদ্বেগ দমন করিতে না পারিয়া যখন তখন নিজের দোকানের চারিপাশে যক্ষের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কয়েক রাত্রি পূর্বে বিজয় ও লক্ষ্মীর পাশ দিয়া যে রাত-ভিখারী চলিয়া গিয়াছিল সেও আর কেহই নয়—তিনি।

ডিজল্‌ভ।

বেলা আন্দাজ এগারোটা। ধনেশের অফিস ঘরে ধনেশ বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে অডিটারবাবু। অডিটারবাবুটির একহারা শুষ্ক চেহারা। মুখে একটি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাব, হিসাবের

কড়ি ছাড়া আর কিছুর প্রতিই তাঁহার আসক্তি নাই। নীলাম্বর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি কোণ লইয়াছেন।

কথা চলিতেছে।

ধনেশ: তা—আপনার রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে, অডিটারবাবু?

অডিটার: লেখা রিপোর্ট যথাসময়ে পাবেন। আপাতত মুখে আপনাকে দু'চারটে কথা বলতে চাই।

ধনেশ: বলুন।

অডিটার: গত বিশ বছর ধ'রে আমরা এই দোকানের হিসেব পরীক্ষা করছি—প্রত্যেকবারই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছে। কিন্তু এবার—আপনার খাতাপত্র পরীক্ষা করে মনে হচ্চে দোকানের অবস্থা শোচনীয়।

ধনেশের মুখ শুকাইয়া গেল।

ধনেশ: শোচনীয়!

অডিটার: অত্যন্ত শোচনীয়। আপনার দোকানের asset বলতে গেলে কিছুই নেই, অথচ বাজারের ধার জমা হয়েছে প্রায় লক্ষ টাকা।

ধনেশ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ধনেশ: Asset কিছুই নেই? অ্যাঁ—নীলাম্বর?

নীলাম্বর জানালার দিক হইতে ফিরিলেন—

নীলাম্বর: বাজে কথা। দোকানের যেমন ধার আছে তেমনি প্রায় দেড় লাখ টাকা বাজারে পাওনাও আছে; অনেক বড় বড় কোম্পানী creditএ মাল নিয়ে গেছে, তারা কালীপূজার পরই টাকা দেবে।

অডিটার ধনেশের পানে চাহিয়া শুষ্ক স্বরে কহিলেন—

অডিটার : আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু আমি পাওনার হিসেবও খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। দুঃখের বিষয়, যেসব বড় বড় কোম্পানীকে বেশী টাকার মাল ধার দেওয়া হয়েছে তার বেশীর ভাগই ভূয়ো কোম্পানী—টাকা আদায় করতে গিয়ে দেখবেন তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

ধনেশ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ধনেশ : অ্যাঁ—ভূয়ো কোম্পানী! অসম্ভব— এ হতেই পারে না। নীলাম্বর—!

নীলাম্বর এবার কোনও উত্তর দিলেন না, সূচীতীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। অডিটারবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার নির্লিপ্ত চক্ষু একবার নীলাম্বরকে পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অডিটার : অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস আপনার দোকানেরই কোনও লোক এই সব ভূয়ো কোম্পানী খাড়া করে তাদের কাছে ধারে মাল বিক্রি করেছে।

ধনেশ : কিন্তু—কিন্তু—কেন?

অডিটার : এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলেন না? যে লোক এই কাজ করছে সে আপনার মাল দোকান থেকে বার করে নিয়ে বাজারে আধা-দরে বিক্রি করে দিয়েছে আর টাকাটা নিজের পকেটে পুরেছে। আপনি যখন নিজের টাকা আদায় করতে যাবেন, দেখবেন আপনার খাতক কোম্পানী উধাও হয়েছে, সে-নামের কোনও কোম্পানীই নেই। আপনি তখন কার কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন?

ধনেশ কিছুক্ষণ পাংশুমুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর গলার মধ্যে বিষম-খাওয়ার মত একটা শব্দ করিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিলেন।

অডিটার : কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে এত কথা বলতে হল। আশা করি ভবিষ্যতে সাবধান হবেন। নমস্কার।

অডিটার বাহির হইয়া গেলেন।

ধনেশ আরও কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন; এই কয়েক মিনিটে তাঁহার যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। সহসা তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধনেশ : নীলাম্বর—তুমি—তুমি আমাকে এমন করে ঠকালে! আমার সর্বনাশ করলে—!

নীলাম্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নীলাম্বর : আমি কিছু করিনি। কিন্তু তুমি যখন আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ তখন আর আমার এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি চললুম।

নীলাম্বর চাদর গলায় দিয়া ঘরের কোণ হইতে নিজের লাঠিটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ধনেশ অক্ষমের নিষ্ফল আস্ফালনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

ধনেশ : যাচ্ছ কোথায়? আমার যথাসর্বস্ব চুরি করে পালাচ্ছ! তোমাকে পুলিশে দেব, জেলে পাঠাব—

নীলাম্বর ফিরিয়া আসিয়া ধনেশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, অবজ্ঞা মিশ্রিত ঘৃণার চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—

নীলাম্বর : মিছে চেঁচামেচি করো না। আমি যে চুরি করেছি তার কোনও প্রমাণ নেই। সব কাজ তুমি নিজের হাতে করেছ, আমি পরামর্শ দিয়েছি মাত্র। আমার পরামর্শ নিলে কেন? না নিলেই পারতে।

ধনেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ধনেশ : উঃ—আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম, আর তুমি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিলে! আমি এখন বাবার কাছে মুখ দেখাব কি করে। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর আমার উপায় নেই।—

নীলাম্বরের চক্ষু একবার একটু নাচিয়া উঠিল!

নীলাম্বর : আমার কথা যদি শোনো—এখনও উপায় আছে!

ধনেশ : আবার তোমার কথা শুনবো!

নীলাম্বর : (নীরসকণ্ঠে) বেশ, শুনো না, যা ভাল হয় কর, আমি চললুম।

নীলাম্বর আবার দ্বারের দিকে ফিরিলেন।

ধনেশ : নীলাম্বর—!

নীলাম্বর : কী বল?

ধনেশ : (অনুনয়ের কণ্ঠে) আমাকে অথৈ জলে ফেলে চলে যেও না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করেছিলুম; যদি কোনও উপায় থাকে বল, আমাকে বাঁচাও!

নীলাম্বর নিষ্করুণ নেত্রে ধনেশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

নীলাম্বর : শোনো, স্পষ্ট কথা বলি। তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, তোমাকে মারলে মারতে পারি, রাখলে রাখতে পারি। যদি বাঁচতে চাও আমার কথা শুনে চলতে হবে; আমি এমন ব্যবস্থা করব, যাতে সব দিক রক্ষে হবে—তোমার লোকসানের টাকা তুমি ফেরৎ পাবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ধনেশ : কী—কি ব্যবস্থা করবে?

নীলাম্বর : বল্‌ব। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও।

ধনেশ: অ্যাঁ—আবার পঞ্চাশ হাজার!

নীলাম্বর: (চক্ষু নাচাইয়া) নিজের পকেট থেকে দিতে হবে না, ইন্সিওর কোম্পানীর কাছ থেকে যে তুলাখ টাকা পাবে তাই থেকে দেবে।

ধনেশের তুই চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

ধনেশ: কী—কি বলছ তুমি—?

নীলাম্বর: শোনো—তোমার দোকানে আগুন লাগবে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দোকান ফায়ার-ইন্সিওর করা আছে, কাজেই তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, বরং তুলাখ টাকা পাবে।—এখন বুঝতে পারছ?

ধনেশ সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধনেশ: অ্যাঁ—না না, এসব কী? আমি—আমি পারব না। শেষে হাতে দড়ি পড়বে—

নীলাম্বর: তোমার ভয় নেই—তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থেকো। যা করবার আমি করব। সব যোগাযোগ ঠিক হয়েছে—কাল কালী-পূজোর রাত্তির। এক ঢিলে তু'পাখী মারব।

ধনেশ: এক ঢিলে তু'পাখী?

নীলাম্বর: (জানালার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ঐ ছোঁড়া শয়তান—আগুন লাগাবার দোষ ওর ঘাড়ে চাপাব। আমাদের কেউই সন্দেহ করবে না, ঐ শত্তুরের হাতে দড়ি পড়বে। সব মতলব ঠিক করে রেখেছি।

ময়াল সাপের সম্মুখে সম্মোহিত খরগোষের মত ধনেশ রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বর: কী বল—শুনবে আমার কথা? তোমাকে কিছু করতে

হবে না—লোকসানের টাকা ফেরৎ পাবে—শত্তুর নাশ হবে। রাজি আছে ?

ধনেশ ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ধনেশ : আমি—আমি কিছু জানি না—

নীলাম্বরের দন্তপংক্তি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল।

নীলাম্বর : আমরা কেউ কিছু জানি না—এখন কাগজ নাও, হ্যাণ্ডনোট লেখো—

তিনি ধনেশের দিকে এক তক্তা কাগজ বাড়াইয়া দিলেন। ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া ঠোঁট চাটিয়া ধনেশ কলম তুলিয়া লইলেন।

ফেড্ আউট।

ফেড্ ইন্।

কালীপূজার রাত্রি। নগরীর অঙ্গে অসংখ্য দীপাবলীর চুমকি জ্বলিতেছে। পথে পথে চৌমাথায় তুবড়ি ফুটিতেছে, রংমশাল জ্বলিতেছে, হাউইয়ের স্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে। দীপান্বিতার যেন আজ বিবাহোৎসব—স্বয়ম্বর রাত্রি।

কোনও দোকানেই কেনা-বেচা বিশেষ নাই—শুধু শোভা। লক্ষ্মী ভাণ্ডারও শোভিত হইয়াছে। মনোহর ভাণ্ডারের শোভা রাত্রি দশটার পর হইতে কিছু ম্লান হইয়া আসিয়াছে—মোমবাতির দীপগুলি অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ; দোকানের দ্বারও বন্ধ।

ধনেশের অফিস ঘরেও দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ। নীলাম্বর ধনেশের চেয়ারে বসিয়া আছেন এবং যত্নসহকারে কাগজে কি লিখিতেছেন ; ধনেশ ভয়ার্ত মুখে তাঁহার পিছন দিকে পায়চারি করিতেছেন। আজ তাঁহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, এখন নীলাম্বর প্রভু, ধনেশ তাঁহার আজ্ঞাবহ।

লিখিতে লিখিতে নীলাম্বর মুখ তুলিলেন—

নীলাম্বর : চাকর-বাকরদের বাড়ি থেকে বিদেয় করেছ ?

ধনেশ : হ্যাঁ, তাদের ছুটি দিয়েছি—নীলাম্বর, আমি এবার যাই—আমাকে তো আর দরকার নেই—

নীলাম্বর : (শুষ্ক স্বরে) না, তোমাকে দিয়ে কোনও কাজই হবে না। তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক গে—কিন্তু ঘুমিওনা—

ধনেশ : না না—

নীলাম্বর : ঘড়ির দিকে নজর রাখবে, আমি রাত্রি বারোটার পর এখানকার সব কাজ সেরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাব, তোমার দরজায় টোকা দিয়ে খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি চলে যাব—তার দশ মিনিট পরে তুমি উঠে চেঁচামেচি যা করবার কোরো, আর লক্ষ্মীকে গারদ ঘর থেকে বার করে নীচে নেমে যেও। এইটুকু তোমার কাজ, বুঝলে ? ঘাবড়ে গিয়ে যেন সব ভণ্ডুল করে ফেলো না।

ধনেশ : (কপালের ঘাম মুছিয়া) না না। আচ্ছা আমি তবে যাই—

ধনেশ চোরের মত প্রস্থান করিলেন। নীলাম্বর কৃপাপূর্ণ নেত্রে তাঁহার কাপুরুষোচিত পলায়ন লক্ষ্য করিয়া আবার লেখায় মন দিলেন। তিনি লিখিতেছেন একটি চিঠি, মেয়েলি ছাঁদে ধরিয়া ধরিয়া লিখিতেছেন—

"আমি বড় বিপদে পড়েছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আজ রাত্রি ঠিক বারোটার সময় আমাদের দোকানের সদর দরজা খোলা থাকবে। তুমি চুপি চুপি এসো, তখন সব কথা বলব। কেউ যেন জানতে না পারে। এ চিঠি পুড়িয়ে ফেলো।

—লক্ষ্মী"

চিঠিখানা লিখিয়া নীলাম্বর উহা সযত্নে পাঠ করিলেন, তারপর ভাঁজ করিয়া একটি খামের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাট।

এই অবসরে একবার চট্ করিয়া লক্ষ্মীর গারদখানা তদারক করিয়া আসা যাক।

ঘরের দ্বারে তেমনি শিকল চড়ানো আছে। ভিতরে লক্ষ্মী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে; তাহার মুখ-চোখ শুষ্ক, চুল রুক্ষ। অনড় হইয়া সে একভাবে বসিয়া আছে, চোখের পল্লব পড়িতেছে না। আহ্লাদী তার প্রসারিত পায়ের কাছে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া আছে। বুড়ি বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কাট।

বিজয়ের দোকানের আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর। বিজয় টেবিলের সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে—কী হইল লক্ষ্মীর? সে কি এখানে নাই, হঠাৎ কোথাও চলিয়া গিয়াছে? তিনদিন জানালা খোলে নাই কেন? যদি কোথাও গিয়াই থাকে, একটা খবর দিয়া গেল না কেন? কিম্বা—কিম্বা—লক্ষ্মীর মন কি তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, আর কি সে তাহাকে চায় না? এমনি হাজার চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে আলোড়িত হইতেছে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের ভিতর তোলপাড় করিতেছে।

রাস্তার অপর পারে মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে দেওয়ালীর আলোগুলি প্রায় সব নিভিয়া গিয়াছে। দরজার কাছে অর্ধ স্বচ্ছ অন্ধকার। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া গিয়াছে।

সদর দরজা একটু ফাঁক করিয়া নীলাম্বর বাহির হইয়া আসিলেন;

তাঁহার হাতে চিঠি। সম্মুখে দীপোজ্জ্বল লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে একবার চাহিলেন, তারপর সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে নামিয়া আসিয়া ফুটপাথের এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ মনোহর ফুটপাথ দিয়া আসিতেছিলেন। পরিধানে সেই দীনহীন বেশ, কম্বল ও মঙ্কিক্যাপে মুখ এমনভাবে ঢাকা যে তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়া চেনা অসাধ্য। হাতের লাঠি প্রতি পদক্ষেপে ঠক্ ঠক্ করিয়া ফুটপাথের উপর পড়িতেছে। নীলাম্বর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন—মনে হইল একটা পাগলাটে বুড়া ভিক্ষুক যাইতেছে।

মনোহর দরজার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় নীলাম্বর চাপা গলায় ডাকিলেন—

নীলাম্বর : ওরে ঐঃ—স্ স্—

মনোহর থামিয়া নীলাম্বরের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

নীলাম্বর : শোন্, ভিক্ষে নিবি? একটা কাজ করিস তো চারটে পয়সা দেব।

মনোহরের মুখ অন্ধকারে দেখা গেল না, তিনি নীরবে হাত পাতিলেন। নীলাম্বর তাঁহার হাতে একটি একানি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন --

নীলাম্বর : এই চিঠিখানা সামনের ঐ দোকানে ফেলে আসবি। বুঝতে পেরেছিস তো—সামনের ঐ দোকান। কাউকে কিছু বলতে হবে না, কেবল চিঠিখানা দোকানের কাউণ্টারের ওপর ফেলে দিয়ে চলে যাবি—পারবি তো?

মনোহর ঘাড় নাড়িলেন, নীলাম্বর তখন তাঁহার হাতে চিঠি দিলেন। চিঠি লইয়া মনোহর রাস্তা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে চলিলেন। নীলাম্বর তাঁহাকে ঠিক পথে যাইতে দেখিয়া

নিঃশব্দে মনোহর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলেন!

মনোহর মন্থর পদে রাস্তা পার হইলেন; ওপারের ল্যাম্পপোষ্টের নীচে পৌঁছিয়া তিনি পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নীলাম্বর অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন তিনি চিঠি খুলিয়া ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিয়া দশ মিনিট। বিজয় টেবিলে কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে—চিন্তা – চিন্তা—কোথায় গেল লক্ষ্মী?

কার্তিক নিজের কাউণ্টারের সম্মুখে মেঝেয় বসিয়া ঢুলিতেছিল। দোকানে খরিদ্দার নাই, রাতও অনেক হইয়াছে; কার্তিক ঢুলিতে ঢুলিতে মাঝে মাঝে চোখ টানিয়া চাহিতেছিল, আবার চক্ষু মুদিতেছিল।

হঠাৎ একখণ্ড কাগজ বাহির হইতে তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। চটকা ভাঙিয়া কার্তিক কিছুক্ষণ কাগজখানার দিকে চাহিয়া রহিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল একখানা চিঠি। সহসা তন্দ্রাজড়িমা কাটিয়া গিয়া তাহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে তড়াক করিয়া উঠিয়া কাউণ্টারের বাহিরে গলা বাড়াইয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পথ শূন্য।

কার্তিক লেখাপড়া জানে না, চিঠিখানা আরও বার দুই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে বিজয়ের কাছে লইয়া গেল।

কার্তিক: চিঠি—কে ফেলে দিয়ে গেল।

চিঠি পড়িয়া বিজয় চনমনে হইয়া উঠিল। তাহার উৎকণ্ঠা এতক্ষণ দিশাহারা হইয়া ছিল, এখন তাহার যাহোক একটা দিশা মিলিল।

লক্ষ্মীর বিপদ! বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা এখনি একটা কিছু করিবার জন্য দড়িছেঁড়া হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া মনোহর ভাণ্ডারে উপস্থিত হয়! কিন্তু এখন সেখানে গিয়া লাভ নাই; বিজয় ঘড়ি দেখিল—সওয়া দশটা। এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী।

কার্তিক দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হাই তুলিতেছিল। বিজয় তাহাকে বলিল—

বিজয়: কার্তিক, তুই বাড়ী যা, রাত হয়েছে। আমি দোকান বন্ধ করে পরে যাব।

কার্তিক নিদ্রালু ভাবে স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বিজয় তখন চিঠি খুলিয়া আবার পড়িল, তারপর দেশালাই জ্বালিয়া চিঠিতে আগুন দিল।

কাট্।

কার্তিক বাড়ি ফিরিতেছে। সদর রাস্তা ছাড়িয়া সে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু দুটি মুদিত, কিন্তু সেজন্য তাহার পথচলার কোনই অসুবিধা হইতেছে না, অভ্যস্ত পদদ্বয় পরিচিত পথে চলিয়াছে।

গলির অপর দিক হইতে মনোহর আসিতেছিলেন; কার্তিককে দেখিয়া তিনি পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কার্তিক নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইবার আয়োজন করিল।

মনোহর তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—

মনোহর: কার্তিক, ওরে কার্তিক ওঠ।

সহসা জাগিয়া কার্তিক সতেজে বলিয়া উঠিল—

কার্তিক : অ্যাঁ—কে ? কি চাও ? কে তুমি ?

মনোহর একটু হাসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন।

মনোহর : পাগলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলিস্ ?

কার্তিক মনোহরকে চিনিতে পারিল।

কার্তিক : ওঁ—বুড়ো বাবু !

মনোহর : হাঁ। আজ তোর ঘুমোনো চলবে না, কার্তিক। অনেক কাজ আছে। আয় আমার সঙ্গে—

মনোহর কার্তিকের কাঁধে হাত দিয়া ফিরাইয়া লইয়া চলিলেন।

বিজয়ের দোকানের ঘড়িতে পৌনে বারোটা।

বিজয় একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দোকান বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সহরের পথে দীপালীর প্রভা তখন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থ বাড়ীর প্রদীপ অধিকাংশ নিভিয়া গিয়াছে; দোকানপাটও একে একে বন্ধ হইতেছে।

কাট্।

ধনেশের শয়ন কক্ষের শয্যার পাশে টিপাইয়ের উপর একটি এলার্ম ঘড়ি রহিয়াছে। ধনেশ বিছানার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। ঘড়িতে বারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট।

ধনেশের চোখে অজ্ঞাত আতঙ্কের বিভীষিকা।

কাট।

আহ্লাদীর অবরুদ্ধ ঘরে চৌকির উপর শুইয়া লক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পায়ের দিকে মেঝেয় বসিয়া আহ্লাদী চৌকির কিনারায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরে একটা গির্জ্জার ঘড়িতে মধ্য রাত্রি বাজিতে আরম্ভ করিল।

কাট।

গির্জার ঘড়ির মন্দ্রগম্ভীর আওয়াজ শেষ হইল।

বিজয় দোকানের দরজায় তালা লাগাইয়া ফুটপাথে ফায়ার ব্রিগেডের স্তম্ভটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখেই মনোহর ভাণ্ডারের বন্ধ দরজা অন্ধকার গহ্বরমুখের মত দেখাইতেছে। পথে কেহ কোথাও নাই। বিজয় সতর্ক দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কাট।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে কেহ নাই, অন্তত কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। একটা বাল্‌ব্‌ উর্ধ্বে থাকিয়া অস্পষ্ট আলো বিকীর্ণ করিতেছে। ধনেশের অফিস ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে, ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছে।

সদর দরজা একটু ফাঁক করিয়া বিজয় দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল; দরজা আবার ভেজাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। অফিস ঘরের আলো চোখে পড়িল; সে সন্তর্পণে সেইদিকে গেল—নিশ্চয় লক্ষ্মী ঐ ঘরেই তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

অফিস ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া বিজয় ভিতরে উঁকি মারিল। নীলাম্বর পর্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল

একটি রবারের খেঁটে; তিনি এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া বিদ্যুৎবেগে বিজয়ের ঘাড়ে এক ঘা খেঁটে বসাইয়া দিলেন। বিজয় নিঃশব্দে হুমড়ি খাইয়া অফিস ঘরের মধ্যে পড়িয়া গেল।

অফিস ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া নীলাম্বর ছুটিয়া গিয়া সদর দরজায় হুড়কা লাগাইলেন; উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু শ্বাপদচক্ষুর মত জ্বলিতে লাগিল। তারপর তিনি ক্ষিপ্র বেগে কাজ আরম্ভ করিলেন; পেট্রোলের একটি ক্যানেস্তারা লইয়া দোকানের চারিদিকে পেট্রোল ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। নির্জন প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোতে এই একটি মানুষের নিঃশব্দ ছুটাছুটি যেন ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অফিস ঘরের মেঝেয় বিজয় মুখ থুবড়িয়া পড়িয়াছিল। তাহার সংজ্ঞা ছিল না। ক্রমে সংজ্ঞা পাইয়া সে নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিল—নেশায় আচ্ছন্ন-বুদ্ধি মাতালের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল। হতা|র ঘাড়ের কাছটা টনটন করিতেছিল, অবশভাবে হাত তুলিয়া সে ঘাড়ে হাত বুলাইতে লাগিল; সহসা তাহার নাকে কাঁচা পেট্রোলের তীব্র গন্ধ প্রবেশ করিল। সে ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল!

দ্বারের বাহিরে নীলাম্বর তখন পেট্রোল ঢালিতেছেন, ক্যানেস্তারা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিজয় উঠিয়া টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে গেল, দ্বার টানিয়া দেখিল বাহির হইতে বন্ধ। কয়েকবার নিস্ফল ধাক্কা দিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু জানালার কাঠের কবাট তালা দিয়া শক্তভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। সেদিক হইতে হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দেখিল, টেবিলের উপর টেলিফোন। এতক্ষণে তাহার মোহগ্রস্ত বুদ্ধি

অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, সে ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল, ব্যগ্রভাবে তাহার মধ্যে ডাক দিল—হ্যালো, হ্যালো! কিন্তু টেলিফোনে কোনও সাড়া নাই। তারপর তাহার নজরে পড়িল টেলিফোনের তার কাটা, তারের ক্ষুদ্র প্রান্তটি শূন্যে ঝুলিতেছে।

ওদিকে নীলাম্বর তৈল সিঞ্চন কার্য শেষ করিয়াছেন। তিনি মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রবারের খেঁটের মাথায় একটি রুমাল বাঁধিতেছেন। এইরূপে একটি মশাল তৈরী হইল, তখন তিনি তাহা স্বল্পাবশিষ্ট পেট্রোলে সিক্ত করিয়া দেশলাই কাঠী জ্বালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তারপর জ্বলন্ত মশালটি উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠিলেন, সেখান হইতে মশালটি ঘুরাইয়া দোকান ঘরের এক প্রান্তে ফেলিলেন! একসঙ্গে খানিকটা স্থান দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্ষিপ্রবেগে বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। নীলাম্বর ক্ষণেক হিংস্রচক্ষে এই অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুত ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

কিন্তু সিঁড়ির মোড় পর্যন্ত গিয়া নীলাম্বর সহসা থামিয়া গেলেন; উপরের বারান্দা হইতে বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলকল ধ্বনি আসিতেছে। নীলাম্বরের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়িল। এ আবার কী!

কার্তিক ও তাহার দল পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিল; মনোহরেব নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা প্রত্যেকটি ঘর খুঁজিয়া দেখিতেছিল। আহ্লাদীর ঘর হইতে সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল—

লক্ষ্মী: একি! কার্তিক, তুই এখানে?

বালকেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল।

কার্তিক: শিগ্‌গির—শিগ্‌গির মিস্‌—নীচে দোকানে আগুন লেগেছে—

এই সময় ধনেশ নিজের ঘরের দরজা হইতে মুণ্ড বাহির করিলেন। লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া একপাল ছোঁড়া জটলা করিতেছে দেখিয়া তিনি সভয়ে মুণ্ড টানিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কার্তিক ওদিকে বলিতেছিল—

কার্তিক : চলুন—চলুন মিস্, আর দেরী করবেন না—এই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলুন—

লক্ষ্মীর চক্ষু কিন্তু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে লুণ্ঠিত আঁচলটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—

লক্ষ্মী : কী—দোকানে আগুন লেগেছে আর আমি পালিয়ে যাব। আয় তোরা আমার সঙ্গে, আগুন নেভাতে হবে—

লক্ষ্মী অগ্রবর্তিনী হইয়া সদর সিঁড়ির দিকে চলিল।

ওদিকে সিঁড়ির মধ্যস্থলে নীলাম্বরের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে—পিছনে আগুন, সম্মুখে পালাইবার পথ বন্ধ। তিনি পাকসাট খাইয়া আবার নীচে নামিতে লাগিলেন—হয়তো এখনও সদর দরজা খুলিয়া পালাইবার সময় আছে।

নীচে দোকানঘরে আগুনের লোলশিখা তখন চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছে; কিন্তু সদর দরজার কাছে দাহ্যবস্তুর অভাবেই বোধ হয় আগুন অগ্রসর হইতে পারে নাই। নীলাম্বর ছুটিয়া গিয়া দ্বারের লোহার হুড়কা খুলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু তিনি দ্বার স্পর্শ করিবার পূর্বেই বাহির হইতে দ্বারের উপর প্রবল ধাক্কা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠে গর্জন উঠিল—

বহুকণ্ঠ : খোলো—দোর খোলো—ভেঙে ফেলো—

নীলাম্বর সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। আর পালাইবার পথ নাই, নিজের রচিত বেড়া জালে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। কোথাও লুকাইবার

স্থানও নাই, আগুনের আলো চারিদিক দিনের মত করিয়া তুলিয়াছে।

সিঁড়ির উপর দুড়দাড় শব্দ করিয়া লক্ষ্মী ও ছেলের দল নামিয়া আসিতেছে। এদিকে সদর দরজায় ধাক্কার বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে —মড়মড় শব্দ হইতেছে। তারপর হঠাৎ দরজার কবাট ভাঙিয়া সবশুদ্ধ ভিতরদিকে আছড়াইয়া পড়িল। একদল লোক হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল—তাহাদের সর্বাগ্রে মনোহর।

মনোহরের আর সে দীন বেশ নাই, তাঁহাকে দেখিয়া শিক্রে বাজপক্ষী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সঙ্গে যে লোকগুলি আসিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহার ভূতপূর্ব কর্মচারী। হনুমান সিংও আছে!

কয়েকজনের হাতে লাঠি ছিল, তাহারা ছুটিয়া গিয়া লাঠি পিটাইয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিল। মনোহরের শ্যেনচক্ষু পড়িল গিয়া নীলাম্বরের উপর। নীলাম্বর এক কোণে গুড়ি মারিয়া ছিলেন, মনোহর তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

মনোহর: ধর ঐ লোকটাকে—

হনুমান সিং প্রমুখ কয়েকজন নীলাম্বরকে ধরিতে গেল; নীলাম্বর কিন্তু সহজে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়, কুকুর-তাড়িত শৃগালের মত আগুনের ফাঁকে ফাঁকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী ইতিমধ্যে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দ বিস্ময়ে মনোহরের পানে তাকাইয়া থাকিয়া হরিণীর মত প্লুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল।

লক্ষ্মী: দাদু—দাদু—দাদু—

মনোহর তাহার দিকে একবার তাকাইলেন, তাঁহার চোখের দৃষ্টি একটু নরম হইল।

মনোহর : লক্ষ্মী ! ছাড়, এখন অনেক কাজ। বিজয় কোথায় ?

লক্ষ্মী উচ্চকিত হইয়া চাহিল।

লক্ষ্মী : কে—? কার কথা বলছ দাদু ?

কিন্তু মনোহর তাহার কথার জবাব দিলেন না ; কার্তিক আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—

মনোহর : কার্তিক, শিগ্‌গির—ফায়ার ব্রিগেড—

কার্তিক : চিকা চিকা বুম।

সে হাউইয়ের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

রাস্তার পরপারে ফায়ার ব্রিগেড স্তম্ভের কাঁচে ঢাকা গোলাকৃতির মুখে কার্তিক ছুটিয়া আসিয়া একটি ঘুষি মারিল। কাঁচ চুরমার হইয়া গেল ; কার্তিক ভিতরে হাত ঢুকাইয়া প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

কাট্।

অফিস ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বিজয় পাগলের মত দরজা ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিল, চেয়ার তুলিয়া দরজার গায়ে আছাড় মারিতেছিল, কিন্তু দরজা অটুট দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরের গোলমালে আওয়াজও কেহ শুনিতে পাইতেছিল না।

দোকানঘরে নীলাম্বর হনুমান সিংয়ের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন ; হনুমান সিং তাঁহাকে বেড়াল ছানার মত প্রায় ঝুলাইতে ঝুলাইতে মনোহরের সম্মুখে লইয়া আসিল। নীলাম্বরের মুখে কালিঝুলি লাগিয়াছে,

পরিধেয় বস্ত্র স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে, কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি। হনুমান তাঁহার ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল—

হনুমান : লিজিয়ে সরকার—এহি আদ্‌মিঠো পাক্কা হারামি হ্যায়। হুকুম হো তো ইসকো আঁগমে ডাল দেঁ।

মনোহরের কিন্তু নীলাম্বরকে শিক-কাবাব করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি নীলাম্বরের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন—

মনোহর : বিজয় কোথায় ?

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিলেন।

নীলাম্বর : অ্যাঁ—আমি, আমি—

মনোহর : তুমি নয়—বিজয় কোথায় ?

নীলাম্বর : অ্যাঁ—বোধ হয়—ঐ ঘরে আছে।

লক্ষ্মী এতক্ষণ মনোহরের একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনোহর তাহাকে বলিলেন—

মনোহর : যা—গ্যাখ গিয়ে আছে কিনা—

লক্ষ্মী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে দূরে ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। নীলাম্বর অধর লেহন কবিয়া মনোহরের পানে তাকাইলেন, তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিল, হয়তো বৃদ্ধের চোখে এখনও ধূলা দিতে পারিবেন।

নীলাম্বর : দেখুন—ঐ বিজয়ই দোকানে আগুন লাগিয়েছে—আমি—

মনোহর : বটে! তুমি কিছু জান না—?

ইতিমধ্যে লক্ষ্মী দ্বারের শিকল খুলিয়া অফিস ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। বিজয় তখন একটা চেয়ার উর্ধ্বে তুলিয়া দরজার গায়ে আছড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, আর একটু হইলেই চেয়ার লক্ষ্মীর মাথায়

পড়িত্‌। চেয়ার ফেলিয়া দিয়া বিজয় লক্ষ্মীকে সবলে জড়াইয়া ধরিল—

বিজয় : লক্ষ্মী—!

লক্ষ্মী : তুমি—!

ওদিকে নীলাম্বর তখনও আশা ছাড়েন নাই, মনোহরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

নীলাম্বর : আমি জানতে পেরেছিলুম বিজয় আজ দোকানে আগুন দিতে আসবে—তাই—

মনোহর : তাই আমার হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলে—চিনতে পারো আমাকে—?

চিনিতে পারিয়া নীলাম্বর প্রকাণ্ড হাঁ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা সদর দরজা দিয়া জলের একটা স্থূলধারা আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িল। ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

এক ঘণ্টা পরের কথা। দোকানের আগুন নিভিয়াছে ; চারিদিক জলে জলময়। মনোহর দোকান হইতে সকলকে বিদায় করিয়াছেন ; কেবল তিনি আছেন, আর আছে লক্ষ্মী ও বিজয়।

একই অপরাধে ধৃত যুগ্ম আসামীর মত বিজয় ও লক্ষ্মী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন কঠোর বিচারকের মত রুদ্র গম্ভীর মুখ লইয়া মনোহর।

এক টিপ নস্য লইয়া মনোহর তীব্র সজল নেত্রে আসামীদ্বয়ের পানে চাহিলেন ; লক্ষ্মীর বুক দুরদুর করিয়া উঠিল।

মনোহর : লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী : (ভয়ে ভয়ে) দাদু ?

মনোহর : তোর সঙ্গে এ ছোঁড়ার কী সম্পর্ক ?

লক্ষ্মী একবার বিজয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বিজয় তখন একবার গলা ঝাড়া দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—

বিজয় : আজ্ঞে আমি—

মনোহর : হ্যাঁ তুমি। আমার নাৎনীর সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা কিসের হে, যে রাতদুপুরে তার চিঠি পেয়ে চোরের মত আমার দোকানে ঢুকেছিলে ?

লক্ষ্মী : (ব্যাকুলকণ্ঠে) দাদু, আমি তো—

মনোহর : চুপ। তোমার সাফাই পরে শুনব। আগে ও বলুক। —কী বলবার আছে তোমার ? আমার নাৎনীর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ ?

বিজয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—

বিজয় : লক্ষ্মী দেবী আমার অংশীদার।

মনোহর একেবারে অবাক হইয়া গেলেন ; এ ধরণের উত্তর তিনি আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই।

মনোহর : অ্যাঁ—অংশীদার ! সে আবার কি ?

বিজয় : আজ্ঞে উনি দু'হাজার টাকা দিয়ে আমার অংশীদার হয়েছেন—লক্ষ্মীভাণ্ডারের অর্ধেক মালিক উনি।

মনোহর : লক্ষ্মী, সত্যি এ কথা ?

লক্ষ্মী : (অস্ফুট কণ্ঠে) হ্যাঁ দাদু—

বিজয় : বিশ্বাস না করেন দলিল দেখাতে পারি।

মনোহর কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত যুবক যুবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী ও বিজয় শঙ্কিতমুখে পরস্পরের পানে চাহিয়া একটু ফিকা হাসিল।

হঠাৎ হাসি থামিল; মনোহর দু'পা আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে বাঁ দিকে ও বিজয়কে ডান দিকে টানিয়া লইলেন। সকৌতুকস্নেহ দৃষ্টিতে একবার ইহাকে একবার উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—

মনোহর : বটে—তোমরা অংশীদার হয়েছ। তাই বুঝি দুপুর রাত্রে চুপি চুপি দেখা করবার দরকার হয়? তা—শুধুই অংশীদার না আর কোনও গণ্ডগোল আছে? আজকালকার তরুণ তরুণীরা শুনেছি চোখোচোখি হতে না হতেই প্রেমে পড়ে যায়, তোমাদের সেসব হাঙ্গামা নেই তো? যাক, বাঁচা গেল।

লক্ষ্মী দাদুর বুকে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—

লক্ষ্মী : দাদু, আমি—। যাও, তুমি তো বুঝতে পেরেছ।

মনোহর : হুঁ হুঁ—তাহলে শুধু ব্যবসার অংশীদার নয়, আরও বড় অংশীদার হবার চেষ্টায় আছ! কি হে ছোকরা, তোমার মতলব কি?

বিজয় হাত জোড় করিল।

বিজয় : আজ্ঞে আপনি অনুমতি দিলেই—

মনোহর দৃঢ় বাহুবন্ধনে তাহাদের আরও কাছে টানিয়া লইলেন। গাঢ়স্বরে কহিলেন—

মনোহর : বেঁচে থাক্—সুখে থাক্। আমার বুড়ো বয়সের

এতবড় ক্ষতিটা আজ তোরাই পূরণ করে দিলি। আমার আশা হয়েছে তোরা আমার কাজ বজায় রাখতে পারবি। এবার আমি তোদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে কাশী যেতে পারব।

ফেড আউট।



২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৪, সিমলাষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।